সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ, জুলাই-আগস্ট, ২০২৩ ■ ৫১তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

গাজায় ইজরায়েলী বর্বরতা চলছে

চার দফা দাবিতে পরিবার-পরিজন সহ গণস্বাক্ষর কর্মসূচী সফল করুন

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে বহুমাত্রিক আক্রমণের মোকাবিলা করতে কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী দ্বিতীয় রাজ্য কাউন্সিল সভা বিগত ১৯-২০ আগস্ট ২০২৩ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল সভা পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস ও সহ সভাপতিত্রয় প্রশান্ত সাহা, রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায় এবং নিবেদিতা দাশগুপ্তকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক শোকপ্রস্তাব পেশ এবং নীরবতা পালনের পরবর্তীতে প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা পেশ করতে গিয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন বিগত কাউন্সিল থেকে আজকের কাউন্সিল সভার মধ্যবর্তী সময়ে পরিস্থিতি অনুকূলে ছিল না। ভিন্নতা, জটিলতার মধ্য দিয়েই সংগ্রাম আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। কর্মচারীদের আন্দোলন, শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলন যেমন ধারাবাহিক ভাবে সংগঠিত হয়েছে, একই সঙ্গে আক্রমণের মাত্রাও বহু গুণ বেড়েছে। অ্যামাজন-ফ্লিপকার্ট-এর মাধ্যমে এ মুহূর্তে সর্বাধিক বিক্রিত খেলনার নামে বুলডোজার, এমনকি রঙ (হোলি) খেলায় সর্বাধিক বিক্রিত পিচকারিও বুলডোজার-এর আকৃতির। জুলাই ২০২০ থেকে

দেবব্রত রায়

উত্তরপ্রদেশে যোগী রাজ্যে শুরু হওয়া বুলডোজার রাজনীতি এ মুহূর্তে

● চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

যথাযথ মর্যাদায় পালিত হল ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সমিতি দপ্তরে ও জেলা

জাতীয় পতাকা উত্তোলন

কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর, মহকুমা কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর সহ কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হল ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে দুপুর ১টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস। এরপর শহীদ বেদীতে মাল্য দান করে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মানস দাস। তারপর সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়, কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীন নেতৃত্ব ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী সহ একাধিক নেতৃত্ব

প্রবীর মুখার্জী

শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে শুরু হয় আলোচনা সভার কাজ। শুরুতেই সাধারন সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে আজকের দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন অনেক রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। অনেক মায়ের কোল খালি হয়েছে, অনেক পরিবারের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে ২৫০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু যে প্রত্যাশা নিয়ে ভারতের আপামর জনগণ বিশেষত শ্রমজীবী মানুষ স্বাধীনতা চেয়েছিল সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। এই সময় দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার মর্মবস্তু আরো বেশি করে আমাদের অনুধাবন করা

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

৪ দফা দাবিতে ৫–৬ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় অবস্থান কর্মসূচী

রাজ্যে কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী, শিক্ষক, শ্রমিকদের সংগঠনগুলির যৌথমঞ্চের আহ্বানে আগামী ৫-৬ ডিসেম্বর '২৩ চার দফা দাবিতে রানী রাসমনি রোডে টানা অবস্থান সমাবেশ কর্মসূচী প্রতিপালিত হবে। এর পূর্বে প্রতিটি জেলায় (দুটি জেলা অন্য দিন করবে) যৌথমঞ্চের উদ্যোগে (কেন্দ্রীয় ৪ দফা ও জেলাগত ২ দফা) ছয় দফা দাবিতে ২২-২৩ নভেম্বর '২৩ অবস্থান সমাবেশ প্রতিপালন করেছে। প্রতিটি জেলায় কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শ্রমিক এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার পরিজন ব্যাপক সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে এই কর্মসূচীকে সফল করেছেন।

আগামী ৫-৬ ডিসেম্বর '২৩ কলকাতার রানী রাসমনি রোড দখল করবে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শ্রমিক এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবার পরিজন। কলকাতা ছাড়াও এই কর্মসূচীতে যুক্ত হবেন হাওড়া, হুগলী, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরবগনার কর্মচারী, শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্তরা।

চার দফা দাবি হল ঃ ১। বকেয়া সহ ৪০ শতাংশ মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফের দাবিতে। ২। স্বচ্ছতার সাথে সমস্ত শূন্য পদে নিয়োগ। সমস্ত ক্ষেত্রের অনিয়মিত ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়মিতকরণ ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে। ৩। জাতীয় শিক্ষানীতি ও রাজ্যের শিক্ষানীতি বাতিল কর, ৪। রাজ্যে বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। □

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ন্যাশনাল কাউন্সিল সভা কলকাতায়, ২৮-৩০ ডিসেম্বর '২৩

এটা অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের বিষয় যে সারা ভরত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ন্যাশনাল কাউন্সিল সভা ২৮-৩০ ডিসেম্বর '২০২৩ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে লবনহ্রদের ই জেড সি সি সভাগৃহে। ইতিমধ্যে গত ৩০ আগস্ট '২৩, এই উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ ফুয়াদ হালিমকে সভাপতি করে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়েছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল সভা আয়োজনের দায়িত্ব যৌথভাবে অর্পিত হয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি সমূহের যৌথ কমিটির উপর। এখন পুরোদমে ন্যাশনাল কাউন্সিলের প্রস্তুতির কাজ চলছে। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উপসমিতি গঠিত হয়েছে। রাজ্যের বর্তমান তৃণমূল সরকার শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায্য দাবিদাওয়া পুরণে নারাজ। দাবি আদায়ের আন্দোলনের উপর নেমে আসছে অভূতপূর্ব আক্রমণ। শারীরিক ও মানসিক আক্রমণ, গ্রেপ্তারী, প্রতিহিংসামূলক বদলী ইত্যাদি নানা ধরনের আক্রমণ নেমে আসছে রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষকদের উপর। এর বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করছে মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করেই লড়াইয়ে প্রথম সাড়িতেই আছি আমরা। এই অসীম সাহসী লড়াই এবং আত্মত্যাগের মানসিকতার স্বীকৃতি হিসাবেই সর্বভারতীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ন্যাশনাল কাউন্সিল সভা আয়োজনের। চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের গুরুভার আমরা গ্রহণ করেছি। পশ্চিমবাংলার সমস্ত কর্মচারীদের সহযোগিতা এক্ষেত্রে আমরা পাব এই বিশ্বাস আমাদের আছে। শুধু আমাদের অংশের কর্মচারী নয়, তার বাইরের সকল কর্মচারী, শিক্ষক ও শ্রমজীবী মানুষের সহযোগিতা আমরা নিশ্চিতভাবেই পাব।

এই ন্যাশনাল কাউন্সিল সভা বহুমাত্রিক তাৎপর্যপূর্ণ। এই সভায় গোটা দেশের নানা ভাষা, নানা পরিধানের কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করবেন। তাদের লড়াই-সংগ্রামের কথা আমরা শুনব। আবার আমাদের রাজ্যের লড়াই সংগ্রামের কথাও অন্যরা শুনবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের, বিভেদের মধ্যে মিলনের স্পষ্ট বার্তা দেবে এই ন্যাশনাল কাউন্সিল সভা। আগামী দিনে গোটা দেশের রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের দিক নির্দেশ করবে এই কাউন্সিল সভা।

এই ন্যাশনাল কাউন্সিল সভার তাৎপর্য সকল কর্মচারীদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। কাউন্সিল সভার বিপুল ব্যয়ভার খুব সামান্য হলেও লাঘব করার জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, প্রত্যেক কর্মচারীর কাছ থেকে মাত্র ২০ টাকার বিশেষ তহবিল (একাধিক কুপন) সংগ্রহ করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে সাধারণ কর্মচারীরাও এই ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে তাদের সংযুক্তি ঘটাতে পারবেন। ৩০ নভেম্বর, ১ ডিসেম্বর '২৩ বিশেষ তহবিল সংগ্রহের 'স্পেশাল ডাইভ ডে' পালিত হবে। □

সারা ভারত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন

জাতীয় কাউন্সিল সভা (২৮-৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩, লবণ হ্রদ, কলকাতা)

সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে

বিশেষ তহবিল

আদায়কারী **২০ টাকা** বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক

(একাধিক কুপন সংগ্রহ করুন)

কমরেড প্রশান্ত সাহার জীবনাবসান

রাজ্যের সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অগ্রনী নেতা, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ-সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ গ্রুড-ডি সরকারী কর্মচারী সমিতির সভাপতি কমরেড প্রশান্ত সাহার জীবনাবসান হয়েছে। গত ২৪ অক্টোবর '২৩, মঙ্গলবার দুপুরে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় মধ্যমগ্রামের শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৭ বছর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যান দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার কারণে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসার পড়ে অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটলে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। তিনি মধ্যমগ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বিশ্রামে ছিলেন। সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

কমরেড প্রশান্ত সাহার স্মরণে বক্তব্য রাখছেন বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ কমরেড প্রশান্ত সাহা ১৯৬৬ সালের ১১ জুলাই তৎকালীন পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) এক নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শম্ভুনাথ সাহা, মাতা বিনোদিনী সাহা। মোট সাত ভাই-বোনের মধ্যে কমরেড সাহা ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কমরেড সাহার পিতা সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং উল্টোডাঙার কাছে মুচিবাজারে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭৩ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে কমরেড সাহা পিতৃহারা হন। নিম্নবিত্ত পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল সদস্যের মৃত্যুর কারণে অভাব-অনটন প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে বিধিবদ্ধ শিক্ষায় বেশিদূর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ হয়নি।

অতি অল্প বয়সেই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক হিসেবে রোজগারের চেষ্টা শুরু করতে হয় কমরেড সাহাকে। এই সময় সি আই টি ইউ-র সাথে যুক্ত হন। তবে তারও আগে দাদা সুশান্ত সাহার উৎসাহে বাসস্থান এলাকার বামপন্থী যুব আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। উপর্যুপরি যুব আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলনের শিক্ষা তাঁকে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই মতাদর্শের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ছিল অটুট। ১৯৮৮ সালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দৈনিক মজুরীতে কাজে যোগ দেন। সেখানে অস্থায়ী কর্মচারীদের সি আই টি ইউ-র পতাকাতলে সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। ১৯৯৬ সালে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত লক্ষাধিক অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতার কারণে কিছুটা বিলম্বে হলেও ১৯৯৮ সালের ২৮ অক্টোবর স্থায়ী কর্মচারী হিসেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় যুবদপ্তরে তিনি কাজে যোগ দেন। শুরু থেকেই তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পতাকাতলে সংগ্রাম

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে

সম্পাদকীয়

গাজায় শিশুঘাতী, নারীঘাতী কুৎসিত আক্রমণ ইজরায়েলের

প্রায় দুই মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। গত ৭ অক্টোবর '২৩ হামাসের পক্ষ থেকে হামলা চালানো হয় ইজরায়েলের উপর। তার প্রত্যাঘাত হিসাবে চলছে গাজায় বসবাসকারী নিরীহ প্যালেস্তিনীয় আরবদের উপর। নির্বিচারে জেনোসাইড চলছে জায়নবাদী ইজরায়েল কর্তৃক। এই পর্যন্ত মৃত পনেরো সহস্রাধিক। তার মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যা অর্ধেকের বেশি। ইজরায়েলের প্রাক্তন সেনাপ্রধান ইয়াকভ আমিদ্রোর ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, এই যুদ্ধ জিততে হলে হামাসকে ধ্বংস করতে হবে। এই হামাসকে খুঁজতে খুঁজতে ইজরায়েল গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল শিফাই-তে পৌঁছে গেছে। সেখানে বোমা মেরে ছিন্ন ভিন্ন করেছে ডাক্তার, নার্স সহ হাসপাতালে চিকিৎসারত মানুষদের। হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশুরা চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর মুখে পতিত। কার্যত তাদের বার্থ সার্টিফিকেট তৈরীর আগেই ডেথ সার্টিফিকেট লিখে ফেলতে হচ্ছে।

এই ইজরায়েলী নির্মমতার পক্ষে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মান সহ ইউরোপের কিছু দেশ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইতিমধ্যে আক্রান্ত প্যালেস্তিনীয়দের জন্য নয়, আক্রমণকারী ইজরায়েলকে ১৪.৩ বিলিয়ন ডলার সহায়তার কথা বলেছে। হামাস মানে মুসলিম, আর মুসলিম মানেই উগ্রপন্থী। সেই তালিবানদের সময় থেকে যে ইসলামিকফোবিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, বর্তমানে হামাসকে আক্রমণের নামে নিরীহ নারী, শিশু হত্যাকে সেই ফোবিয়া দিয়ে আড়াল করার প্রচেষ্টা চলছে। অথচ তালিবানদের যেমন হীন স্বার্থে তৈরি ও মদত দেওয়ার পরে তারাই সাম্রাজ্যবাদীদের ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পরিণত হয়েছিল, হামাসও তাই। সাম্রাজ্যবাদ সবসময় যুদ্ধ, পররাষ্ট্র আক্রমণকে ইন্ধন দিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করে। যে ইজরায়েলী ক্ষেপনাস্ত্রগুলি গাজাবাসীদের, নারী-শিশু নির্বিশেষে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে, তার বিক্রেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইজরায়েলের অস্ত্র ভাণ্ডারের সিংহভাগ অস্ত্রের বিক্রেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সুতরাং এই যুদ্ধে প্যালেস্তিনীয়দের যত সর্বনাশই হোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বারোটা মাসই পৌষ মাস।

হামাসকে সৃষ্টি ও পেছন থেকে মদত দেওয়ার ঘটনাও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একই পরম্পরার সাক্ষী। ১৯৮৮ সালে যখন রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন সংঘর্ষ বিরতির বিষয়টি একটা পর্যায়ে এসেছিল, তখনই হামাসের উদ্ভব। ১৯৮৮-তে ইয়াসের আরাফতের পি এল ও রাষ্ট্রসংঘের পরিকল্পিত দেশভাগের নীতি মেনে নেয়। ইজরায়েলের দখলদারীকে কার্যত মেনে নিয়েছিলেন আরাফত শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে। তা সত্ত্বেও ইজরায়েল তাদের দখলকারী প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ড প্যালেস্তাইনকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে। সেই প্রেক্ষাপটেই শেখ আহমেদ ইয়াসিল নামে একজন প্যালেস্তিনীয় ইমাম হামাস প্রতিষ্ঠা করে। হামাসের মূল দাবি ছিল ইজরায়েলকে ধ্বংস করা। যদিও ২০০৫ সালে তারা সেই দাবি প্রত্যাহার করে।

ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংকট দীর্ঘদিনের। অটোমাস সাম্রাজ্যের পতনের পর ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ অটোমান সাম্রাজ্যের ভাগ বাটোয়ারা করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। ১৯২২ সালে লীগ অফ নেশনস অটোমান সাম্রাজ্যের আর কয়েকটা দেশের সাথে প্যালেস্তাইনকে ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেয়। ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের সমর্থনে পুষ্ট ইজরায়েলি অনুপ্রবেশকারীদের (যারা ইহুদী) বিরুদ্ধে প্যালেস্তিনীয় আরবরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যা আরব বিদ্রোহ নামে পরিচিত। যদিও ১৯৩৯-এ এই বিদ্রোহকে দমন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু সংঘর্ষের সেই শুরু। ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রসংঘ তার ১৮১(২) নম্বর প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে প্যালেস্তিনীয় আরব ও ইহুদীদের দুটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়। একই সাথে এই প্রস্তাবে জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ আন্তর্জাতিকভাবে হবে বলে জানায়। ১৪ মে ১৯৪৮ ডেভিড বেন-কুরিয়ন ইজরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণা করেন এবং সেই রাষ্ট্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। ঐদিনই তড়িঘড়ি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ইজরায়েল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেন। ১৯৬৪ সালে পি এল ও গঠিত হয়। নিজদেশে পরবাসী হয়ে থাকার নিদারুণ যন্ত্রণার প্রতিকার চেয়ে প্যালেস্তিনীয়দের সংগ্রাম নতুন পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৮৮ সালে পি এল ও নেতা ইয়াসের আরাফত প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে। ইয়াসের আরাফতের জনপ্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতেই হামাস সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদন পায়। পরবর্তীকালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে ইজরায়েল প্যালেস্তিনীয়দের এলাকা দখল করতে করতে এই মুহূর্তে ভূখণ্ডের দু-প্রান্তে গাজা স্ট্রিপ এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে এর সামান্য অংশ ছাড়া গোটাটাই দখল করে ফেলেছে। ১৯৬৭ সালে ইজরায়েল একতরফা ভাবে ইজিপ্টের থেকে সিনাই, জর্ডনের ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও পূর্ব জেরুজালেম এবং সিরিয়ার গোলান হাইট্স দখল করে। ইজিপ্ট ও সিরিয়া পরবর্তীকালে দখলীকৃত এলাকা ফেরত পেলেও ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ছাড়েনি ইজরায়েল। ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক সীমান্তে অমানবিক প্রাচীর নির্মাণ করে সেখানকার অধিবাসীদের অবরুদ্ধ করা হচ্ছে। ২০০৪-এ আরাফাতের মৃত্যু হয়। ২০০৬ সালে হামাস আইনসভার নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করলে, ইজরায়েল তার বিরোধিতা করে। শুরুর দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং বর্তমানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে ইজরায়েল ক্রমশ উদ্ধত আক্রমণ নামিয়ে এনেছে ঐ ভূখণ্ডের আদিবাসিন্দা আরবসের উপর। জায়নবাদী ইজরায়েলের আক্রমণে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে ফ্যাসিস্ত কায়দায়। রাষ্ট্রসংঘ যখনই হস্তক্ষেপ করেছে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রাষ্ট্রসংঘকে পাত্তা না দিয়ে জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানীর স্বীকৃতি দিয়ে, মার্কিন দূতাবাস জেরুজালেমে স্থানান্তর করেছিলেন পূর্বতন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর পাশে আছে বাইডেন। এযাবৎকালের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ইজরায়েলী নৃশংসতার সাক্ষী হচ্ছে গোটা বিশ্ব।

হামাসকে সন্ত্রাসবাদী বলে একতরফা দেগে দিচ্ছে কর্পোরেট মিডিয়া। তারা একবারও ইজরায়েলের দীর্ঘসময় ধরে আগ্রাসন এবং হামাসের মতো কট্টরবাদী সংগঠনের উৎপত্তির কারণ খুঁজে দেখছে না বা দুনিয়াকে দেখাতে চাইছে না তাদের প্রভুদের নির্দেশে। আদপে হামাস একটি কট্টরবাদী সংগঠন। তারা প্যালেস্তাইনের বুকে ইহুদি রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। তাদের লক্ষ্য পশ্চিম ভূমধ্যসাগর থেকে পূর্বে জর্ডন নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে এক এবং একমাত্র প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠন। পরবর্তী সময়ে প্যালেস্তাইনের দুই প্রধান শক্তি হামাস ও আরাফত নির্মিত রাজনৈতিক দল ফতোহ্ নিজেদের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটিয়ে বোঝাপড়া করে যে, হামাস গাজা ও ফাতাহ ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করবে। হামাসকে উৎফাত করার লক্ষে গাজার উপর ইজরায়েলের ধারাবাহিক আক্রমণ চলছে ২০০৮ সাল থেকে। হাজার হাজার নারী, শিশু সহ সাধারণ মানুষকে তারা হত্যা করেছে। রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্তও তারা মানে না। কখনও সংঘর্ষ, কখনও সংঘর্ষ বিরতি, এই-ই চলছে।

সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া যতই ইজরায়েলের পাশে দাঁড়াক, কর্পোরেট মিডিয়া যতই ইজরায়েলের এই নৃশংস আক্রমণকে কখনও লঘু করে, কখনও সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে আড়াল করার চেষ্টা করুক, দুনিয়াজুড়ে মানবিকতার পক্ষে থাকা মানুষ ইজরায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছে, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবাদ হচ্ছে। সম্প্রতি লন্ডন সাক্ষী থেকেছে প্যালেস্তাইনকে সংহতি জানিয়ে আজ পর্যন্ত বৃহত্তম মিছিলের। প্রায় ৮ লক্ষ্য মানুষ মধ্য লন্ডনের হাইড পার্ক থেকে মার্কিন দূতাবাস পর্যন্ত এই মিছিলে সামিল ছিলেন, নভেম্বরের ১১ তারিখ। সমবেত মানুষের দাবি ছিল অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি। বিগত তিন সপ্তাহের মধ্যে এটি ছিল তৃতীয় মিছিল। এই মিছিল হয়েছে শাসকের হুমকি, রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে। আরও অন্যান্য দেশেও এই প্রতিবাদ হচ্ছে, কিন্তু ব্রিটেনের প্রতিবাদ বেশি তাৎপর্যের। কারণ এখানে শাসক দল (কনজারভেটিভ পার্টি) ও বিরোধী দল (লেবার পার্টি) উভয়েই ইজরায়েল পন্থী।

বিপরীতে ভারতের অবস্থান অত্যন্ত লজ্জাস্কর। ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব থেকেই প্যালেস্তাইনের উপর ইহুদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে। ১৯৩৮-এ গান্ধীজি লিখেছিলেন— "প্যালেস্তাইনে আরবদের জমি ইহুদিদের দ্বারা দখলের কাজ ভুল এবং অমানবিক। বর্তমানে প্যালেস্তাইনে যা ঘটছে তাকে কোনোভাবেই বৈধতা দেওয়া যায় না।" পরবর্তীকালে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনও স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের পক্ষে ছিল, যার গুরুত্বপূর্ণ শরিক ছিল ভারত। কিন্তু মোদি সরকারের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীতে। এটা ভুললে চলবে না, প্যালেস্তাইনের সাথে রণনীতিগত সম্পর্ক ভারতের সাথে প্রথম স্থাপিত হয় বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের (এন ডি এ) আমলে। ২০০০ সালে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে প্রথমবারের জন্য তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী এল. কে আদবানী ইজরায়েল সফরে গেছিলেন। সে দেশের সাথে নানা ধরনের সামরিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইজরায়েলের প্রথমবারের জন্য জায়নবাদী প্রধানমন্ত্রী অরিয়েল শারন ভারত সফরে এসেছিলেন। নরেন্দ্র মোদী এই রণনীতিগত বোঝাপড়া আরও গভীরতর করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সাথে। বর্তমানে ইজরায়েল প্রযুক্তিগত এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ইত্যাদি ভারতে সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। ভারতে বিরোধীদের উপর নজরদারী চালানোর জন্য ব্যবহৃত পেগাসাস স্পাইহয়ার ইজরায়েল সরকারের অনুমোদনে ভারতে সরবরাহকৃত হয়েছিল।

যখন গোটা পৃথিবীজুড়ে ইজরায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, তখন বরাবর প্যালেস্তাইনবাসীর স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থানকারী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়নি, ভোটদানে বিরত থেকেছে। রাখঢাক না করে বর্তমান সরকার ইজরায়েল এবং তার মিত্র মার্কিন রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান ঘোষণা করেছে।

ভারতবাসী হিসাবে আমরা অবশ্যই লজ্জিত কেন্দ্রীয় সরকারের এই আচরণে। শুধু কী তাই, ইজরায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংহতি জানানোর কোনো কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকার করতে দিচ্ছে না। মুম্বাইতে ১৪ নভেম্বর শিশু দিবস প্রতিপালনের সময় গাজায় ইজরায়েলের আক্রমণে নিহত শিশুদের স্মরণে ছোটো ছোটো শিশু সহ কিছু মানুষ জুহু বিচে জড়ো হয়েছিল। ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই দিনে দিল্লী পুলিশ ইমামদের নোটিশ পাঠিয়ে বলে মসজিদে প্রার্থনার সময় গাজায় ইজরায়েলী আক্রমণ নিয়ে কোনো শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না। এ কোন ভারতে আছি আমরা? এটা শুধু বাক্ স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের উপর নয়, ধর্মপালনের স্বাধীনতার উপরও আক্রমণ। একই উদ্দেশ্যে শ্রীনগরে প্রশাসনিক আদেশ জারি করে শহরের প্রধান মসজিদে ১৩ অক্টোবর থেকে শুক্রবারের প্রার্থনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৩ নভেম্বর রামলীলা ময়দানে কর্মচারী-শিক্ষক সমাবেশে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা-কর্মীরা ইজরায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে বডি পোস্টার পড়েছিলেন বলে তাদের গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হয়। এরকম ঘটনার সাক্ষী অতীতে হয়নি সংগঠনের।

জায়নবাদী নেতানিয়াহু আরব মুসলীমদের শত্রু ঘোষণা করেছে। ফ্যাসিবাদের মূল প্রবণতাই হল একটা অংশকে শত্রু চিহ্নিত করে, তাদের নিকেশ করা। আমাদের দেশের হিন্দুত্ববাদীদের আরাধ্য হিটলার-মুসোলিনী। তারা তো মুসলীমদের এদেশে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। প্যালেস্তাইন মানেই হামাস, হামাস মানেই মুসলীম সন্ত্রাসবাদী, মানেই তারা ভারতেরও শত্রু। সুতরাং এই সরকার যা করছে তা তাদের দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গীতে মানানসই। সেই কবে ১৯২৩ সালে সাভারকার প্যালেস্তাইনে ইহুদিদের বসতি স্থাপনকে সমর্থন করেছিলেন যে।

প্যালেস্তাইন আক্রান্ত, আমরাও আজ নিরাপদ নই। অধিকাংশ ভারতীয় ইজরায়েলের এই আক্রমণ সমর্থন করে না। তারা রাস্তায় নামছে। কেরলে, কলকাতায় ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদী মানুষ সোচ্চার হচ্ছেন মিছিল, জমায়েতের মাধ্যমে। আমরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা জনগণেরই অংশ। বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে, অর্জিত অধিকার রক্ষার্থে আমরা যেমন রাস্তায় থাকব, তেমনই প্যালেস্তাইন নারী শিশু সহ সাধারণ নীরিহ মানুষ যখন জেনোসাইডের বলি হবে ইজরায়েলী জায়নবাদীদের দ্বারা, তখনও আমাদের সোচ্চার হতে হবে। এটাই আমাদের পরম্পরা।

প্যালেস্তিনীদের উপর ইজরায়েলী মারণযজ্ঞ যে প্রেক্ষাপটে, যে ঐতিহাসিক পরম্পরায় হচ্ছে—তা প্রতিবাদীহীন ভাবে চলতে দিলে গোটা পৃথিবীটাই নিরাপদ নয়। □

২৫ নভেম্বর, ২০২৩

শোক সংবাদ

এন শঙ্করাইয়া

প্রয়াত হলেন দেশের প্রবীনতম বামপন্থী নেতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী এন শঙ্করাইয়া। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০২ বছর। শারীরিক অসুস্থতার কারণে গত ১৩ নভেম্বর সোমবার চেন্নাইয়ের এক বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৫ নভেম্বর বুধবার সকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আজীবন মানুষের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া এন শঙ্করাইয়া ছিলেন বামপন্থী পার্টির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ।

১৫ জুলাই ১৯২২ সালে থোথুকুদি জেলার কোভিলপট্টিতে জন্মগ্রহণ করেন এন শঙ্করাইয়া। স্থানীয় এলাকায় প্রাথমিক পাঠ শেষে তিনি মানুদরাই-আমেরিকান কলেজে ভর্তি হন এবং ইতিহাসে স্নাতক হন। অল্প বয়সেই তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন এবং যে কারণে একাধিকবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। তিনি প্রথম কারাবরণ করেন মাত্র ২০ বছর বয়সে, ১৯৪১ সালে। এরপর ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ার কারণে তাঁর পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। জেল থেকে মুক্তির পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। এরপর ১৯১৬ সালে তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি ছাড়া পান ১৯৪৭ সালে। এই বছরের জুলাই মাসে মাদুরাই কামরাজ ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি দেবার প্রস্তাব নেওয়া হলেও তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল সম্মতি না দেওয়ার জন্য তা প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

স্বাধীনতা পরবর্তীপর্বে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৭ (মাদুরাই ওয়েস্ট বিধানসভা কেন্দ্র) এবং ১৯৮০ সাল (মাদুরাই ইস্ট বিধানসভা কেন্দ্র) থেকে তামিলনাড়ুর বিধানসবায় বিধায়ক নির্বাচিত হন।

২০২১ সালে তাঁকে তামিলনাড়ুর সর্বোচ্চ সম্মান থাগাইসাল তামিজহার-এ ভূষিত করা হয়। এই সম্মানের অর্থমূল্য দশ লক্ষ টাকার সবটাই এই বামপন্থী নেতা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করে দেন।

এন শঙ্করাইয়া কৃষক আন্দোলনের সর্বভারতীয় স্তরে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৮৬-১৯৮৯ পর্বে তিনি সারা ভারত কৃষক সভার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৯২-১৯৯৫ তিনি ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি। এই সময়কালেই উদারনীতি চালু হয়। তার ধাক্কা পড়তে শুরু করে কৃষি ও কৃষকের জীবনে। তাঁর নেতৃত্বেই একটি বিকল্প কৃষি নীতি দেশের সামনে পেশ করা হয়েছিল। তিনি কৃষক সংগ্রাম এবং প্রগতিশীল আন্দোলনকে পথনির্দেশিকা দিয়ে গেছেন।

তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা, তাঁর পাঠ ও অনুশীলনের পরিধি ছিল বিরল। সমসাময়িক ঘটনার তথ্য তাঁর দখলে থাকত। তামিল সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর গভীর পড়াশোনা সর্বজনস্বীকৃত। □

বাসুদেব আচারিয়া

হায়দ্রাবাদে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রয়াত হলেন বামপন্থী আন্দোলনের নেতা, শ্রমজীবীদের সুহৃদ এবং প্রাক্তন সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া। বার্ধক্যজনীত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদের একটি বেসরকারী হাসপাতালে দীর্ঘ রোগভোগের পর এই প্রবীণ বাম নেতা ১৩ নভেম্বর, সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাঁকুড়ার ন'বারের সাংসদ বাসুদেব আচারিয়ার প্রয়াণে দলমত নির্বিশেষে সমাজের বিশিষ্টজনেরা শোক প্রকাশ করেছেন। শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি এবং শ্রমজীবী জনগণের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন তিনি।

বাঁকুড়ার ন'বারের বাম সাংসদ বর্ষীয়ান নেতা আচারিয়ার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ তাঁর অজ পারাগ্রাম বেড়ো থেকে শিল্প শহর হয়ে রেল শহর আদ্রা। এই তল্লাটে তাঁর জন্ম বা বেড়ে ওঠা শুধু নয়, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে 'শিল্পায়নের কান্ডারী' তিনি। তাঁর জন্যই পশ্চিমাঞ্চলের রেল যোগাযোগ আজ মজবুত। পুরুলিয়ার আদ্রা-রঘুনাথপুরের কাছে তিনি 'ঘরের ছেলে' ছিলেন।

১৯৪২ সালের ১১ জুলাই পুরুলিয়ার বেড়ো গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৮০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি লোকসভার সদস্য। লোকসভার সদস্য থাকাকালীন তিনি রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটি, কমিটি অন এগ্রিকালচার, কমিটি অফ পাবলিক আন্ডারটেকিং-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। আমৃত্যু তিনি ছিলেন সি আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি পুরুলিয়া জেলার সম্পাদক ছিলেন। ছিলেন পুরুলিয়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সংসদের চেয়ারম্যান, অল ইন্ডিয়া এল আই সি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, কোল এন্ড অ্যাশ ওয়ার্কস ইউনিয়ন, এফ সি আই লেবার ইউনিয়ন, ডিভিসি শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে যুক্ত ছিলেন।

১৯৭৪ সালে ঐতিহাসিক রেল শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। তিনি কাশিপুর পঞ্চকোট রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পরে আদ্রার নিগম নগর এন এস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। ১৯৮৯ সালে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে বামপন্থী আন্দোলনে সর্বক্ষণের কর্মী হন। বি ভি আর রেলপথ সম্প্রসারণ, আদ্রা-পুরুলিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় ফুট, ওভার ব্রীজ তৈরি, বিভিন্ন জেলার একাধিক ট্রেন এবং প্রকল্পের জন্য তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। অসুস্থ অবস্থায়ও পুরুলিয়া-ঝাড়গ্রাম নতুন রেলপথের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দিল্লীতে রীতিমতো দরবার করে ডিভিসি-র তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পকে রঘুনাথপুরে নিয়ে আসার পাশাপাশি মধুকুণ্ডাতেও এ সি সি-কে নিয়ে এসেছিলেন সিমেন্ট কারখানা করার জন্য। শ্রমিক আন্দোলনের এই অবিসংবাদী নেতার মৃত্যুতে শোকের ছায়া সর্বত্র। ১৩ নভেম্বর দুপুরে শেষ হয়ে গেল একটা দীর্ঘ রাজনৈতিক অধ্যায়ের। এই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে দলমত নির্বিশেষেই প্রয়াত নেতার প্রতি শোকজ্ঞাপন করেন সবাই।

উল্লেখ্য এই প্রয়াত নেতার স্ত্রী অল্পদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর দুই কন্যা ও এক পুত্র রয়েছেন। □

সুকান্ত চৌধুরী

প্রসঙ্গ ঃ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

সমতার বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে অভিন্নতা কাম্য নয়

মানস কুমার বড়ুয়া

সংঘ পরিবারের মেরুকরণের রাজনীতির গুরুত্বপূণ প্রসঙ্গ হল দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform Civil Code, UCC) চালু করা। রামমন্দির নির্মাণের মতোই এটাকে তারা 'পবিত্র' কর্তব্য বলেই মনে করে। ওদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি বিজেপি কেন্দ্রে একক গরিষ্ঠতা নিয়ে উপর্যুপরি দ্বিতীয় বারের জন্য ক্ষমতাসীন হয়েছে। বিজেপি-র নির্বাচনী ইস্তেহারেও দেশে অভিন্ন ন্যূনতম বিধি চালু করার কথা বলা আছে। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের লক্ষ্যে এই প্রসঙ্গটি আবার সামনে আনা হচ্ছে। সংঘ পরিবারের হিন্দুত্বের রাজনীতির অন্যতম টার্গেট সমাজের মধ্যবিত্ত অংশ। মধ্যবিত্তদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমরা সরকারী কর্মচারীরা। তাই আর এস এস-বিজেপি-র মেরুকরণের রাজনীতির মোকাবিলা করতে গেলে UCC বা এই ধরনের ইস্যুগুলি নিয়ে 'আদার ব্যবসায়ীর' মতো উদাসীন থাকাটা সমীচিন তো নয়ই, বিপজ্জনকও বটে। সেই নিরিখেই এই নিবন্ধের অবচারণা।

দেওয়ানি বিধি কি?

আমাদের দেশে সকলের জন্য প্রযোজ্য বিধি বা আইন (যেমন ফৌজিদারী আইন) যেমন রয়েছে, আবার নানা সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত নিজস্ব কিছু বিধি আছে। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির অধিকার, অভিভাবকত্ব, ভরণপোষণ, দত্তক গ্রহণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীগত নিজস্ব, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রথাগত যে বিধি আছে তাকেই দেওয়ানি বিধি বলে। সংবিধানে এই দেওয়ানি বিধির বিষয়টি ভারতের বহুত্ববাদী চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতায় ঐতিহাসিকভাবেই এসেছে। বিজেপি-আর এস এস-র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির অন্যতম স্লোগান 'এক দেশ, এক আইন'। যেটি বর্তমানে প্রাসঙ্গিক না হলেও, তাকে কার্যকর করার লক্ষ্যেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার উদ্যোগ।

সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ৪৪ নম্বর ধারায় এর উল্লেখ করে গেছেন। সেখানে গোটা দেশের সমস্ত নাগরিকদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে প্রয়াস চালাতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সংবিধান হঠাৎ করে UCC চাপিয়ে দেওয়ার কথা বলেনি। কোনো সময়সীমাও বেঁধে দেয়নি। কেবল অভিন্ন বিধি কার্যকর করার প্রয়াস গ্রহণের কথা বলেছে। এই প্রয়াসের উদ্যোগে অন্তত দুটি দিক থাকা উচিৎ। প্রথমত বিদ্যমান সমস্ত গোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায়, সেই গোষ্ঠীর জনগণ বিশেষত মহিলাদের সাথে নিবিড় আলোচনা ও মতামত গ্রহণ। এই প্রক্রিয়া নিশ্চিতভাবেই দীর্ঘকালীন হবে। দ্বিতীয়ত প্রতিটি ক্ষেত্রে দেওয়ানি বিধিগুলিতে যে অসমতা আছে, বিশেষত প্রতিটি বিধিতেই মহিলাদের প্রতি যে বৈষম্য আছে সেগুলিকে সংস্কার করে সমতা আনতে হবে। বিজেপি বা হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়, কিন্তু হিন্দু কোডগুলির মধ্যে নারীদের প্রতি যে বৈষম্য রয়েছে তা দূরীকরণের প্রসঙ্গ নিয়ে বোবা হয়ে থাকে। আসু প্রয়োজন সমতা বিধানের, সমতা আর অভিন্নতা সমার্থক নয়।

২১তম আইন কমিশনের বক্তব্য

অভিন্ন ন্যূনতম বিধি চালু করতে মোদি সরকার ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি এস চৌহানের নেতৃত্বে ২১তম আইন কমিশন গঠন করে। কমিশন ২০১৮ সালে পারিবারিক আইন সংস্কার বিষয়ক কিছু ইতিবাচক সংস্কারের সুপারিশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে।

অভিন্ন ন্যূনতম বিধি সম্পর্কে ২১তম আইন কমিশনের বক্তব্য ছিল যে এটা প্রয়োজনীয় নয়, কাম্যও নয় (neither necessary nor desirable)। আইন কমিশন সুপারিশ করে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট, প্রোটেকশন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট ইত্যাদি সেকুলার আইনগুলিকে আরও শক্তিশালী ও প্রসারিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও প্রথাগত আইনের বিস্তৃত পর্যালোচনা করে পারিবারিক আইন ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত আইনের সংস্কারের সুপারিশ করে। দীর্ঘ এবং বিস্তৃত আলোচনা, ৭৫,৩৭৮ জনের মতামত বিবেচনার পর কমিশন এই সুপারিশ করে। এই সুপারিশের সারমর্ম হল বিভিন্ন দেওয়ানি আইনে মহিলাদের প্রতি যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করে দেওয়ানি বিধি সংস্কারের একটা মাপকাঠি নির্মাণ করতে হবে। ২১তম আইন কমিশনের অত্যন্ত ইতিবাচক সুপারিশ মোদী সরকার ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরিকে কটাক্ষ করে আইন কমিশন বলেছে যে কেবল আইনের বিভিন্নতা আছে বলেই তা বৈষম্য সূচীত করে না, বরং এই বিষয়টা গণতন্ত্রের ব্যাপকতাকে মান্যতা দেয়। মোদি সরকারের দেওয়ানি বিধি সংস্কারের সদিচ্ছা থাকলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে আলোচনা (বিশেষত সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মহিলাদের সাথে) শুরু করতে পারত। তা না করে ২১তম আইন কমিশনের সুপারিশ ডীপ ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিয়ে অভিন্ন উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রিতুরাজ অবস্থির নেতৃত্বে ২২তম আইন কমিশন গঠন করেছে। কারণ সংঘ পরিবারের এই মুহূর্তে তুরুপের তাস স্লোগান—এক দেশ, এক আইন।

নারীদের অধিকার এবং দ্বিচারিতা

সম্প্রতি ভোপালে একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরিতে তার সরকারের লক্ষ্য স্থির আছে বলে পুনরায় বলেছেন। এর বিরোধীদের তিনি 'তোষণকারী' বলে গালও পারেন। তিনি বলেন এক দেশে দু'ধরনের আইন কেন থাকবে। দু'ধরনের আইন বলতে, টার্গেট যে কেবল মুসলিম সম্প্রদায় তা বোঝা যায়, যখন বার বার তার মুখে ধ্বনীত হয় ''আমাদের মুসলিম মেয়েরা'' এই শব্দবন্ধটি।

মুসলিম মেয়েদের মসীহা হিসাবে দাবিদার মোদী তিন তালাক বেআইনী করা তাঁর কৃতিত্ব বলে দাবি করলেও আইন কমিশনের বক্তব্য হল সুপ্রিম কোর্ট এটিকে বেআইনী করেছে। কারণ এটা গুরুত্বপূর্ণ (essential) কোনো ধর্মীয় আচার নয়। সর্বোচ্চ আদালত চেয়েছিল মুসলিম নারীদের সুরক্ষায় যথাযথ আইন প্রণয়ন করুক কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু মোদী সরকার যে আইন এনেছে তার মধ্য দিয়ে মুসলিম পুরুষদের জেলে পোরার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মুসলিম নারীদের কোনো কল্যাণ হয়নি। অর্থাৎ তিন তালাক রদকে ইস্যু করে মুসলিম নারীদের পক্ষে মোদী সরকার রয়েছে এই প্রচারও একটা জুমলা।

দ্বিতীয়ত নারীদের অধিকার রক্ষায় ধর্মীয় জিগির তোলাটাও সংঘ পরিবারের অন্যতম রণকৌশল। মনুবাদী দর্শনে বিশ্বাসীরা নারীদের কোন চোখে দেখে তা আমরা জানি। সম্প্রতি মণিপুরে আদিবাসী মহিলারা লাঞ্ছনার শিকার হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর অপ্রত্যাশিত দীর্ঘ নীরবতা সেই দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত ঘটনা।

'মুসলিম নারী'দের ভালোর জন্য অভিন্ন ন্যূনতম বিধি আনতে চাওয়া হচ্ছে। একই ইস্যুতে নাগা নারীদের প্রতি উল্টো পথে হাঁটা কেন? ঘটনা হল ২০১২ সাল থেকে নাগল্যান্ডে স্থানীয় সংস্থাগুলিতে নির্বাচন হয় না। কারণ অধিকাংশ নাগাগ্রুপ মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের বিরোধিতা করে। বিরোধিতাকারীদের বক্তব্য এই সংরক্ষণ নাগা প্রথাগত আইনের বিরোধী। এর বিরুদ্ধে নাগা মহিলাদের সংগঠন নাগা উইমেনস এসোসিয়েশন সহ প্রায় সব সর্বভারতীয় মহিলা সংগঠন দাবি করেছে যে অবিলম্বে নাগাল্যান্ডে মহিলাদের এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ চালু করা হোক। তাদের বক্তব্য যে নাগা কাস্টমারি ল এর দ্বারা কোনওভাবে লঙ্ঘিত হয় না। সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশন ফাইল হয়। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়ে হলফনামা দিতে বললেও সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে তা দাখিল করেনি। এতে বিরক্ত হয়ে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে ভর্ৎসনাও করে। প্রধানমন্ত্রীর তথাকথিত 'মুসলিম মহিলা'দের প্রতি সহানুভূতি নাগা মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে না কেন? কেন কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে মৌন? এই বছরের এপ্রিলে বিধানসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিজেপি জোট সরকার গঠিত হয়েছে নাগাল্যান্ডে। উপমুখ্যমন্ত্রী বিজেপির প্রতিনিধি। ডাবল ইঞ্জিনের সরকারকে মহিলাদের সংরক্ষণ চালু করতে আটকাচ্ছে কে? রাজ্য বিজেপি সভাপতি এই বিষয়ে উপজাতি সংগঠনগুলির সাথে আলোচনার কথা বলছেন। এটাও দ্বিচারিতা। কারণ জাতীয় ক্ষেত্রে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার জন্য তারাই তো আলোচনার ধার ধারে না।

দ্বিতীয় ধরনের দ্বিচারিত হল এক দেশে দু'রকম আইন নাগাল্যান্ডের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে যখন টার্গেট করতে হয় তখন 'এক দেশ এক আইন' স্লোগান জরুরী হয়।

আদালত বা সংবিধানের অসত্য দোহাই

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আর এস এস-বিজেপি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির তাস খেলে মেরুকরণ করতে চাইছে। এই প্রসঙ্গে তারা সর্বোচ্চ আদালতের দোহাইও দিচ্ছে। অথচ আমরা জানি সুপ্রিম কোর্ট অতীতে এই ধরনের কিছু বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে, নির্দেশ নয়। উদাহরণ হিসাবে ১৯৮৫ শাহবানু মামলা, ১৯৯৫-এ সুবলা মুদগ্যাল বনাম ভারত রাষ্ট্র মামলা—ইত্যাদি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তার গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ পেশ করেছে।

বিজেপি এক্ষেত্রে সংবিধানকেও ব্যবহার করতে চাইছে। ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি যে সংবিধানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার বিষয়টি নির্দেশাত্মক নীতিতে আছে এবং এটা চালু করার জন্য কোনো সময়সীমা নির্ধারিত করা নেই। সংবিধানের ২৫-২৮ নং ধারায় ধর্মের স্বাধীনতা রক্ষা ও নিজ ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখার অধিকার দিয়েছে। ২৯(৩) ধারা সাংস্কৃতির বহুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। 'এক দেশ এক বিধান' চাওয়া বিজেপি বিপরীত দিকের এই বক্তব্যগুলি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যায়।

তাছাড়া আমাদের দেশে অভিন্ন ফৌজদারি আইনের সঙ্গে বেশ কিছু দেওয়ানি আইন আছে যেগুলি অভিন্ন। যেমন, ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, নিবন্ধীকরণ আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, শিশু বিবাহ প্রতিরোধ আইন ইত্যাদি।

মূল উদ্দেশ্য

বিজেপি-আর এস এস-র অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে এত যে হইচই তার মূল টার্গেট মুসলিম পার্সোনাল ল। ওদের বক্তব্যের মোদ্দা কথা হল যে যা কিছু দেওয়ানি বিধিগত সমস্যা তা ঐ একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। কিন্তু এটা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। দেওয়ানি বিধি সংক্রান্ত ভিন্নতা শুধু মুসলিমদের মধ্যে নয় হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মবলম্বীদের নিজস্ব ব্যক্তিগত আইনেও আছে। তারাও ভিন্নতা ভোগ করে। কিন্তু ওদের টার্গেট কেবল মুসলিম সংখ্যালঘুরা। সম্প্রতি জাতীয় মহিলা কমিশন কেবলমাত্র মুসলিম মহিলা পার্সোনাল ল নিয়ে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের মতামত চেয়েছে। আর এস এস রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সব প্রতিষ্ঠানে তাদের আদর্শের ধারক-বাহকদের প্রতিষ্ঠিত করছে, তার অন্যতম প্রমাণ জাতীয় মহিলা কমিশনের একটি বিবৃতি। তাতে বলা হয়েছে যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির অনুপস্থিতি অসাম্য এবং বিভেদের সৃষ্টি করছে এবং এর ফলে সামাজিক সম্প্রীতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং লিঙ্গ সমতা আনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেবল অভিন্নতা থাকলেই লিঙ্গ সমতা বা অন্যান্য সমস্যা দূর হয়ে যাবে—এটা সঠিক নয়। কারণ অভিন্নতা আর সমতা কখনোই এক অর্থ ব্যক্ত করে না। এর মধ্য দিয়ে আসলে সংখ্যাগুরুর আইনকে মূল ভিত্তি করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার চেষ্টা হচ্ছে।

সব ধর্মীয় দেওয়ানি আইনের মতোই হিন্দু কোড-এও প্রচুর বৈষম্য আছে, বিশেষ করে নারীর সমানাধিকারের প্রশ্নে। এর সংস্কারের কথা বলে না আর এস এস-বিজেপি। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে বলা যায়, হিন্দু আইনে নারীদের ভাইদের সাথে পূর্ব পুরুষের উত্তরাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে, পছন্দের স্বামী নির্বাচন করতে এবং স্বামীর সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার ক্ষেত্রে, বিচ্ছেদের অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সমতা নেই। বিচ্ছেদ বা খোরপোশের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় নারীদের। স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহ করলে মৃত স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত অধিকার হারানো, বিবাহোত্তর অর্জিত সম্পত্তিতে নারীদের কোনো অধিকার না থাকা ইত্যাদি বঞ্চনার উপাদানও হিন্দু আইনে আছে। আবার উত্তর পূর্বাঞ্চলের কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীর নারীদের একাধিক স্বামী থাকার প্রথাও চালু আছে। এত কিছু অসমতা সমন্বিত হিন্দু কোড অভিন্ন বিধির মডেল কী করে হতে পারে? হিন্দু আইনেও প্রচুর সংস্কার প্রয়োজন সেটা মনে করে না মোদি সরকার। আর নারীদের প্রতি কেন্দ্রের শাসকদলের দৃষ্টিভঙ্গী বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মহিলাদের লাঞ্ছনা, অধিকার হরণের বিষয়গুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

একই সঙ্গে এটাও ঠিক মুসলিম পার্সোনাল ল সংস্কারের উর্দ্ধে নয়। মুসলিম পার্সোনাল ল ১৯৩৫ সাল থেকে আমাদের দেশে চালু হয়েছে। এক্ষেত্রে একটা ধারণা চালু আছে যে শরিয়তি আইন সংস্কার যোগ্য নয়। এটাও সঠিক নয়। মুসলিম পার্সোনাল ল-এর ভিত্তি শুধু কোরান নয়, হাদিশ, ইজমা, কেয়াস ও ইস্তেহাদও আছে। কোরান ছাড়া বাকিগুলির প্রামাণ্যতা, নির্ভুলতা নিয়ে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। শরিয়তি আইনের অনেকগুলি নবম ও দশম শতাব্দীর ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় গড়ে উঠেছিল। যে কোনো বিধি বা আইনের প্রণয়ন আর্থ সামাজিক অবস্থার উপরও অনেকটাই নির্ভর করে। সুতরাং তা অলঙ্ঘনীয় নয়। তুরস্ক, তিউনিশিয়া, মরক্কো, ইরাক, আলজিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি বহু মুসলিম দেশে শরিয়তি আইনের সংস্কার হয়েছে। অবিভক্ত পাকিস্তানেও ১৯৬১, ১৯৬২ সালে শরিয়তি আইনের কিছু সংশোধন হয়েছে।

উপজাতিদের প্রসঙ্গ ঃ

হিন্দু কোডে হিন্দু উপজাতি গোষ্ঠীগুলি প্রসঙ্গে নানা প্রথাগত অধিকার ভোগ করার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ২১তম আইন কমিশন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নে সমস্যার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলের উল্লেখ করেছে। ষষ্ঠ তপশীলের ২৪৪ নম্বর ধারা (যা ত্রিপুরা, আসাম, মিজোরাম, মেঘালয়ের জনজাতি এলাকার জন্য প্রযোজ্য) অনুযায়ী যে সমস্ত জেলা ও আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠিত হবে, সেগুলি পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নিজস্ব আইন রচনা করা এবং রাজ্যপালের অনুমোদন নিয়ে তা কার্যকর করতে পারবে। এছাড়াও সংবিধানের ৩৭১ এ, বি, সি, এফ, জি ও এইচ এই ধারাগুলি মোতাবেক উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছয়টি রাজ্য বিশেষ কিছু অধিকার এবং ছাড় ভোগ করতে পারবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ৩৭১এ অনুযায়ী নাগা সম্প্রদায় এবং ৩৭১ জি অনুযায়ী মিজো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথাগুলি সুরক্ষিত রাখার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দ্বারা এগুলি আক্রান্ত হবে এই আশঙ্কা নিয়ে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১২ জনের একটি প্রতিনিধি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে সম্প্রতি সাক্ষাৎ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিচারিতাকে উন্মুক্ত করেছে শুধু তাই নয়, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পরিকল্পনা যে দেশের নির্দিষ্ট একটি অংশকে টার্গেট করেই—সেই সন্দেহ আরও জোড়ালো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উক্ত প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার খ্রিস্টান সম্প্রদায় ও কিছু উপজাতি এলাকাকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আওতার বাইরে রাখবে।

তাহলে গোয়ায় কেন?

সংঘ পরিবার নিজেদের মূল পরিকল্পনাকে আড়াল করতে গিয়ে বলছে, গোয়ায় যখন দীর্ঘদিন ধরে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু আছে, তখন গোটা দেশে চালু করতে অসুবিধা কোথায়। এই বক্তব্যে চালাকির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। গোয়ায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চলছে এটা অর্ধ সত্য কথা। বরং গোয়া সিভিল কোডের অন্তর্বস্তু জানলে এটা পরিষ্কার হবে কেন গোটা দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা এই মুহূর্তে কাম্য নয়। পর্তুগীজ শাসন থেকেই গোয়াতে কিছু সাধারণ পারিবারিক আইন আছে যা সব অংশের মানুষকে মেনে চলতে হয়। কিন্তু গোয়া সিভিল কোড হল বিভিন্ন অংশের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনের কিছু কিছু অংশ নিয়ে একটা প্যাকেজ। যার মধ্যে বহু ক্ষেত্রে সমতা নেই। যেমন বিবাহ সংক্রান্ত আইন ক্যাথলিক, হিন্দু এবং মুসলিমদের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। গোয়া কোডের একটা আলাদা ধারায় (The Gentile Hindu customs and usages code) নারীদের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক বিধির কথা বলা আছে। হিন্দু পুরুষদের দুইবার বিবাহের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বলা আছে যদি একজন হিন্দু স্ত্রী তার ২৫

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও সাংগঠনিক পেজ উদ্বোধন

সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে। সমগ্র কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস। কর্মশালায় প্রারম্ভিক বক্তব্য উত্থাপন করতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায় বলেন সামাজিক মাধ্যমকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা বর্তমান সময়ে জরুরি প্রয়োজন। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির কাছে রাস্তায় থাকাটা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে সঙ্গী করে বিকল্প ভাবনা বেশি বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে নিজস্ব ট্রেডগত দাবিদাওয়া আদায়ের পূর্বশর্ত সমাজকে গঠন করা, ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যেই এই ডিজিটাল ওয়ার্কশপ।

সাম্প্রতিক সময়ে মেইন স্ট্রিম মিডিয়া, কর্পোরেট মিডিয়ার একপেশে প্রচার আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই সংগ্রামের প্রচারের ক্ষেত্রে নিজেদের আরও শানিত, সংহত করে নেওয়ার চেষ্টাতেই এই কর্মশালা। প্রতিনিয়ত মিথ্যাকে 'সত্যে' পরিণত করার বিপরীতে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার অসম লড়াই লড়তে নেমে নিজেদের যে অস্ত্র আছে সেই অস্ত্রকে আরও ভালো করে নেওয়া, বুঝে নেওয়া, প্রয়োগ ঘটানোর স্বার্থেই এই উদ্যোগ।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সোশ্যাল মিডিয়া উপসমিতির আহ্বায়ক সুমনকান্তি নাগ বলেন সোশ্যাল মিডিয়ার পরিসর এবং সাধারণভাবে সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নয়া উদারবাদী আক্রমণ মতাদর্শ ও চেতনার জগতে বিভ্রম ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। শাসকশ্রেণী তার মতাদর্শের প্রচার চালায় প্রতিটি বিভাগে। সে জানে কোথায় তার শ্রেণীস্বার্থ লুকিয়ে। প্রতিটি পরিসরে শাসকশ্রেণী প্রতিটি লয়ে হস্তক্ষেপ করে চলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার অন্যনতা হল তার বিষয়বস্তু তৈরি করে ব্যবহারকারী নিজেই (ইউজার-জেনারেটেড কনটেন্ট)। সোশ্যাল মিডিয়া যেন একধরনের অরাজনৈতিক আত্মকেন্দ্রিকতার ফাঁদ পেতে বসে আছে। আদতে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক সচেতনতাই সঠিক পথে থাকতে, সঠিক পথ বেছে নিতে সাহায্য করে। আমাদের প্রচারের ক্ষেত্রে অ-রাজনৈতিক ব্যক্তি প্রচার এবং সাবজেক্টিভিজমের কোনো স্থান নেই। প্রতিদিনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড আমাদের প্রতিনিয়ত এই শিক্ষাই দেয়।

কর্মশালায় উপস্থিত বিশিষ্ট সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞ অবীন মিত্র উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, গণমাধ্যমের চৌহদ্দিতে আছেন অথচ সামাজিক মাধমের অলিন্দে ঘোরাফেরা করেন না এমন মানুষের খোঁজ পাওয়া সত্যিই কঠিন। সামাজিক মাধ্যমকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, এটা এখন আর আলোচনার বিষয় নয়। এই স্তর আমরা পেরিয়ে এসেছি। এখন মূল প্রশ্ন—কিভাবে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করব?

সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্বের কারণ নানাবিধ।

প্রথমত, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছানো যায়। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিপুল এবং তা প্রতিদিন বাড়ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব ক্রমবর্ধমান।

দ্বিতীয়ত, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নতুন অংশের মানুষের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে। ব্যবহারকারীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। প্রতি পাঁচ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ৪৬১.১ মিলিয়ন মানুষ। দেশে ফেসবুক সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করে ২৪১ মিলিয়ন মানুষ যা আমেরিকার তুলনায় বেশি।

তৃতীয়ত, সোশ্যাল মিডিয়া মারফৎ সংযোগের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক দূরত্ব কোনো বাধা নয়।

চতুর্থত, প্রযুক্তির কারণেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে টেক্সট, অডিও-ভিডিও কনটেন্ট আকর্ষণীয়ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। প্রযুক্তিগতভাবে তা দ্বিমুখী—Interactive।

গোটা দুনিয়ায় নানা ধরনের সামাজিক মাধ্যম জনপ্রিয়তার নিরিখে বেড়ে চলেছে, আর সেই সব ধরনের উপস্থিতির ধারক রূপে সামাজিক মাধ্যম একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম বা পরিসরে পরিণত হয়েছে। এই পরিসর একদিকে যেমন বিপুল তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম, অন্যদিকে এর ব্যবহার তথা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথেই তা হয়ে উঠেছে এক অশেষ সম্ভাবনার ক্ষেত্র।

এদিনের কর্মশালায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিজস্ব ফেসবুক পেজ-এর উদ্বোধন করে বিশিষ্ট তথ্যপ্রযুক্তিবিদ তথা এদিনের প্রধান অতিথি সুশোভন পাত্র বলেন, সামাজিক মাধ্যম আসলে ইন্টারনেটের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইন্টারনেট চালিত গণমাধ্যম অন-লাইন মাধ্যম নামে পরিচিত। সামাজিক মাধ্যমও তাই। কিন্তু সব অন-লাইন মিডিয়াই সামাজিক মাধ্যম নয়। আসলে সামাজিক মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা প্রচারযোগ্য তথ্য প্রস্তুত ও বিনিময় করতে পারে, যা প্রথাগত পরিভাষায় 'ইউসার জেনারেটেড কনটেন্ট' হিসাবে পরিচিত। এই মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ আর প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকলেই ব্যবহারকারীর জন্য খুলে যায় তথ্য ও বিনিয়োগকারীর জন্য বিপুল সম্ভাবনার দিক।

সামাজিক মাধ্যমে কতকগুলি নির্দিষ্ট চরিত্রাবলি আছে। এই পরিসরে সবচেয়ে জরুরি বিষয় তাৎক্ষণিকতা। যে কোনো ঘটনা ঘটার পর যত দ্রুত তা এই পরিসরে দৃষ্টিগোচর করা যায় এবং তার সম্পর্কে আলোচনা বা মতামত ব্যক্ত করা যায়, ততই তা প্রাসঙ্গিক হয়। সেই নিরিখে সামাজিক মাধ্যম যে কোনো ঘটনায় দ্রুত প্রতিক্রিয়া দাবি করে। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অনেকের কাছে একযোগে তথ্য ও বার্তা খুব অল্প সময়ে ছড়িয়ে দেওয়া এই মাধ্যমের শক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়। প্রযুক্তি সম্পর্কে বোঝাপড়া থাকলে এবং বিশেষ সামাজিক মাধ্যমের নির্দিষ্ট চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলে এই পরিসরে তথ্য জোগাড় করা সহজ। এই সহজলভ্যতা সামাজিক মাধ্যমের জনপ্রিয়তার এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এই পরিসরে আর এক বিশেষ চরিত্র হল তথ্য বা বার্তার ব্যবহারযোগ্যতা। খুব সহজেই এই পরিসরে পাওয়া তথ্য বা বার্তার পুনর্ব্যবহার করা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

সোশ্যাল মিডিয়ার নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘ জানিয়েছে ভারতে পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত ৯৭ কোটি মানুষ। কিন্তু এই তথ্যটি কি আপনার-আমার টাইমলাইনে এসেছে। যেখানে সার্ভে বলছে ৮৪ শতাংশ ভারতীয়র প্রাইমারি সোর্স অফ্ ইনফরমেশন অনলাইন। আর তার মধ্যে ৬৪ শতাংশ ভারতীয়র প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফরমেশন সোশ্যাল মিডিয়া। অর্থাৎ প্রতিদিন তারা যাবতীয় খবর পান, দেখেন বা পড়েন ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউবের মাধ্যমে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে তা কি নিরপেক্ষ!

কোন পদ্ধতিতে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করব এই বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, শাসকশ্রেণী স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায়। আমাদের দায়িত্ব সেই স্থিতাবস্থাকে ভেঙে এগিয়ে যাওয়া। সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি মূলত পেশাদার এজেন্সিকে ব্যবহার করে বিপুল অর্থের বিনিময়ে। আমাদের কাজ হবে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিচালিত সাংগঠনিক উদ্যোগে। এক্ষেত্রে অ্যাজিটেশন-প্রপাগাণ্ডা'র নীতি আমাদের দিক নির্দেশিকা।

নিজস্ব কর্মীবাহিনী গঠন করে, তাদের সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত চেতনায় শাণিত করে এবং পেশাদারি দক্ষতা (স্কিল) অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেই কাজ করতে হবে। সচেতন এবং সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণই আমাদের পথ।

এই মুহূর্তে শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষত সাম্প্রদায়িক শক্তি আক্রমণাত্মকভাবে পেশাদারদের নিয়োগ করে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করছে। বিপুল অর্থবলে বলীয়ান এইসব শক্তির 'উত্তর-সত্য' পুষ্ট প্রচারের লক্ষ্য কোটি কোটি সাধারণ মানুষ। বিকল্প উদ্যোগকে জোরদার করতে না পারলে শাসকশ্রেণীই একতরফা প্রচার চালাবে।

কর্মশালায় উপস্থিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত / সহযোগী সংগঠনের কর্মী / নেতৃত্ব, বিভিন্ন জেলা / অঞ্চল থেকে আগত কর্মী নেতৃত্ব সহ উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, মিডিয়া গবেষণার সব অভিজ্ঞতাই আমাদের শেখায় যে, কোনো একটি মাধ্যম, তা সে যতই ক্ষমতাশালী হোক না কেন, এককভাবে কার্যকর প্রচারের মাধ্যম হতে পারে না। সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেও একথা সত্যি, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করলেও সংগঠনের মুখপত্রের গুরুত্ব কমছে না। মিছিল, মিটিং, সভা সমাবেশের মতো সংযোগের অন্যান্য পন্থা-প্রকরণের গুরুত্বও এতটুকু কমছে না। সোশ্যাল মিডিয়াকে অবশ্যই আমাদের লড়াই আন্দোলনের একটি মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া সর্বস্তরতা নয় রাস্তার আন্দোলনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ শুধু নেটে নয় রাজপথে হেটেও লড়াই আন্দোলনে সামিল হতে হবে। বাস্তবে বিভিন্ন মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মিথোজীবিতা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। অতএব, সমাজে আধিপত্যবাদের বিপ্রতীপে যারা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, তাদের প্রচারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সংগঠনের বিনির্মাণ। সামাজিক মাধ্যমের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যদি বিকল্পের কথা, আধিপত্য ভাঙার কথা, সমানাধিকারের ভাবনার কথা বলতে হয়, তবে সর্বপ্রথম এই পরিসরের আনুষঙ্গিক আত্মমুখীনতার ভাবনাকে বিনির্মান করা জরুরি। কতিপয়ের আধিপত্য ভেঙে বৃহৎ প্রেক্ষাপটে উত্তরণের জন্য সামাজিক মাধ্যমে বিকল্প ভাষ্যের চর্চা ও প্রসার জরুরি।

কর্মশালার সঞ্চালক তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, সংগঠনের ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটকে ব্যবহার করে সাংগঠনিক কার্যকলাপকে সমস্ত সদস্যবন্ধু তথা কর্মচারী সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে সকলকেই উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। □

দেবাশীষ রায়

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

গোটা উত্তর ভারত জুড়ে চলছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার নামে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, যা হিন্দুত্ববাদীদের লক্ষ্য।

২০০২-এ গুজরাট দাঙ্গা আর আজকের মণিপুরের ঘটনা একই সুতোয় বাধা রয়েছে। আর এস এস-এর অ্যাজেন্ডা দ্রুতলয়ে কার্যকর করছে বিজেপি। যা গত তিন-চার মাসে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মণিপুরের ঘটনা সংবিধান ও বহুত্ববাদের ওপর আক্রমণ সবটাই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। মণিপুরে জাতিদাঙ্গা ঘটিয়ে ধর্মীয় মেরুকরণের সাথে সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ / খনিজ সম্পদ কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যেই এক নির্দিষ্ট জনজাতিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যেও রাজনৈতিক সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হল সাম্প্রতিক সময়ে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেমন শাসকদল ও প্রশাসনের একাংশের আক্রমণ দারুণভাবে বিরোধী দল বিশেষত বামপন্থীদের ওপর নামিয়ে আনা হয়েছে, একই সঙ্গে বামপন্থীদের নেতৃত্বে মানুষকে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ প্রতিরোধ সংগঠিত হয়েছে। বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের আহ্বান অনুযায়ী পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে বৃহত্তর সংগ্রামকে বাস্তবায়িত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব রূপায়ন করে মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ, ১০ মার্চ, ২০২৩ রাজ্যের কর্মচারী সমাজ সমস্ত ধরনের প্রশাসনিক হুমকিকে উপেক্ষা করে রাজ্য সরকারের আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে বৃহত্তর ঐক্যের সম্মিলিত সিদ্ধান্তক্রমে রাজ্যব্যাপী প্রশাসনকে স্তব্ধ করে রচনা করে সংগ্রাম-আন্দোলনের নতুন ইতিহাস। ৫ এপ্রিল, ২০২৩ দিল্লীতে শ্রমিক-কৃষক সংঘর্ষ যাত্রায় সারা রাজ্য থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী-নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। ৬ এপ্রিল রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী কর্মবিরতি প্রতিপালন করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিষয় সহ পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দুর্নীতির দায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ওপর চাপাচ্ছেন, আমরা তার বক্তব্য ধারন করেছি, গ্রহণ নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে শুধুমাত্র কর্মচারীর নিরাপত্তার জন্য নয় সামগ্রিকভাবে সমগ্র জনগণের (কর্মচারী সহ) নিরাপত্তা চেয়ে নির্বাচন কমিশনে সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছিল। আমরা জানি বামপন্থাকে দুর্বল না করে দক্ষিণপন্থা এগিয়ে যেতে পারে না। আমাদের রাজ্যেও এ ঘটনা ঘটছে না তা বলা যাবে না। যারা শুধুমাত্র কর্মচারীদের নিরাপত্তা চাইছেন তারা মণিপুরের মানুষের নিরাপত্তা চাইছেন না। সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে কর্মচারী আন্দোলন এগিয়ে যেতে পারে না। লক্ষ্য এবং পথ স্থির রেখে বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত সমিতি এগিয়ে চলেছে শতবর্ষ সহ গৌরবজ্জ্বল অতীতকে ধারণ করে। বিভ্রান্তির উপাদানও রয়েছে, সাম্প্রতিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৃত্যুর দুঃখজনক ঘটনায় র‍্যাগিংয়ের বিষয়টিকে লঘু করে অন্যান্য ঘটনাকে সামনে তুলে আনার চেষ্টা চলছে, মূল লক্ষ্য জে এন ইউ, জামিয়া মিলিয়ার মতো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা। অন্যান্য ঘটনার মতোই এখানেও আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু করা হচ্ছে বামপন্থীদের, বাক্‌স্বাধীনতা ও মুক্তমনা সংস্কৃতিকেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এই আক্রমণের ক্ষেত্রে রাজ্যের শাসকদল এবং কেন্দ্রের শাসকদলের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। ১৭-২০ এপ্রিল '২০২৩ সংগঠনের অভ্যন্তরে কাঠামোকে সচল করতে এবং কর্মচারীদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্লক সফর অত্যন্ত সাফল্যের সাথেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুধু লড়াই-আন্দোলন কর্মসূচী নয় কাঠামোকে সচেতন, সচল, ক্রিয়াশীল রাখতে পারছি কিনা তার ধারাবাহিক চেকআপ প্রয়োজন। ৪মে ২০২৩ যৌথ মঞ্চের আহ্বানে 'নবান্ন অভিযান' কর্মসূচীতে সমস্ত প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতিফলন ঘটে। অধিকারের ওপর আক্রমণ হলে সংগঠন বসে থাকবে না। নবান্ন অভিযানকে বানচাল করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দারুণ সমস্যা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে সংগঠন তাৎক্ষণিকভাবে বিচার ব্যবস্থার দারস্থ হয়, কলকাতা হাইকোর্টে কেস ফাইল করা হয়। নবান্ন অভিযানে যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অভিযান কর্মসূচী ঐতিহাসিক মাত্রা পেয়েছে। কিন্তু আমাদের মূল্যায়ন করা দরকার প্রশাসনিকভাবে আমরা যে দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করছি, সাংগঠনিক ভাবে কর্মী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তা একইরকম থাকছে তো? সংগঠনের প্রতি দায়বদ্ধতা, কর্মচারীদের অধিকারের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আরও যত্নবান হতে হবে। সম্পাদকমণ্ডলী থেকে সম্পাদকমণ্ডলীর সভা নয় প্রতিদিন সংগঠন দপ্তরে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। টি.আর-৭-এর মাধ্যমে ৩৬ টাকা প্রতীকী অর্থ প্রেরণের কর্মসূচী নির্দিষ্ট লক্ষ্যেই নেওয়া হয়েছিল। দ্রুততার সঙ্গে টি.আর-৭-এর একটি কপি সংগঠনগতভাবে নবান্নে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়াও বিগত ১ মে, ২০২৩ ঐতিহাসিক মে দিবসের কর্মসূচী, ১০ মে দিল্লীতে আন্দোলনরত কুস্তিগীরদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে ও অপরাধী বিজেপি সাংসদদের গ্রেপ্তারের দাবিতে টিফিনের সময় বিক্ষোভের কর্মসূচী সহ, ১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচী ও মণিপুরে জাতি দাঙ্গা ঘটিয়ে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় মহিলাদের ওপর অত্যাচার এবং মালদহ সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মহিলাদের ওপর নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে ২৫ জুলাই, ২০২৩ কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে মৌন মিছিল ও জেলায় জেলায় মৌন মিছিল ও প্রতিবাদ সভা সহ বিভিন্ন তাৎক্ষণিক কর্মসূচী এসময়কালে সংগঠিত হয়েছে।

আগামী কর্মসূচীর বিষয়ে প্রস্তাবনা

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা প্রতিহত করতে হবে

প্রণব কর

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়কালে কোম্পানীর ডিরেক্টররা ভারত শাসনের জন্য উচ্চপদস্থ অফিসারদের মনোনীত করতেন এবং তারপর তাদের লন্ডনের হেইলিবারি কলেজে প্রশিক্ষণ দিয়ে ভারতে পাঠাতেন শাসনকার্য পরিচালনার জন্য। পরবর্তীতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটিতে ১৮৫৪ সালে লর্ড মেকলের পেশ করা একটি রিপোর্টে মনোনয়নের পরিবর্তে ভারতে একটি প্রতিযোগিতামূলক, মেধা ভিত্তিক এবং আধুনিক সিভিল সার্ভিস গঠনের প্রথম ধারণা দেওয়া হয়। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৮৫৪ সালে লন্ডনে সিভিল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয় এবং ১৮৫৫ সালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সূচনা হয়। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ৯৬ (সি) ধারায় ভারতে একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের কথা বলা হয় যার কাজ হবে—"Discharge, in regard to recruitment and control of Public Services in India, such functions as may be assigned thereto by rules made by the Secretary of state in Council". বিভিন্ন টালবাহানার পরে ১৯২৪ সালে গঠিত Lee Commission (Royal Commission on the Superior Civil Services in India) অবিলম্বে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের সুপারিশ করে। ফলে ১৯২৬ সালের ১ অক্টোবর ভারতে পাবলিক সার্ভিস গঠিত হয়। আবার ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ফেডারেশনের জন্য ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং বিভিন্ন প্রভিন্সের জন্য প্রভিন্সিয়াল পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয়। এপ্রিল, ১৯৩৭ সালে। বাংলার ক্ষেত্রে নাম হয় 'বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন'। স্বাধীনতার পরে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নাম হয় ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নাম করা হয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল। সংবিধানের ৩১৫ থেকে ৩২৩ নং ধারায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের গঠন, কর্তব্য, আর্থিক সংস্থান, কার্যপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে।

জন্মলগ্ন থেকে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে এই কমিশন। ২০১১ অবধি কোনও কলঙ্কের দাগ লাগেনি এই কমিশনের গায়ে। ডঃ বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যানকে ফোন করে দেখা করতে বললে, কমিশনের চেয়ারম্যান প্রত্যুত্তরে বলেন যে, "I am the Chairman of Public Service Commission, not your servant. If you wish you may meet me at my chamber". সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের আমলে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে ১৭,০০০-এর মতো কংগ্রেসী ঢুকেছিল, কিন্তু কমিশনে কোনও হস্তক্ষেপ করতে পারেননি।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বেশ কিছু ঘটনা ঘটছে যা আগামীদিনে বিভিন্ন সরকারী পদে স্বচ্ছ নিয়োগের ক্ষেত্রে একাধিক সমস্যার জন্ম দিতে পারে।

বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগের ক্ষেত্রে সারা দেশে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। ২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা নেয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ১৩ লক্ষের অধিক পরীক্ষার্থীদের মধ্য থেকে স্বচ্ছতার সঙ্গে বেছে নেওয়া হয় যোগ্য প্রার্থীদের। এক দুরূহ জটিল কাজকে দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে কমিশন। কিন্তু এই সফল প্রার্থীদের কাজে যোগদান করতে করতে ২০১১ সালে সরকারের পরিবর্তন ঘটে যায়। তৃণমূল সরকার এসেই এই সফল প্রার্থীদের কাজে যোগদান বন্ধ করে দেয়। শেষপর্যন্ত কোর্টে মামলা করে দীর্ঘ টালবাহানার পরে তারা চাকরিতে যোগদান করতে পারেন। এর থেকে বোঝা যায় যে একেবারে গোড়া থেকেই তৃণমূল সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে অস্বীকার করতে চাইছিল। কমিশন যেভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকারি নিয়োগের পরীক্ষা পরিচালনা করেছে তা নতুন সরকারের নাপসন্দ ছিল। পরবর্তীতে নিয়োগ সংক্রান্ত যে বিপুল দুর্নীতির জাল সারা রাজ্যে ছড়ায় তার অশনী সঙ্কেত সেদিন কমিশনের কাজে বাধা দেবার মধ্য দিয়েই দেখা গিয়েছিল।

আবার বামফ্রন্ট সরকার ২০০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাতে করে দূর দূরান্ত থেকে প্রার্থীদের বারে বারে কলকাতায় ছুটে আসতে না হয়। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তিনটি আঞ্চলিক অফিস খোলার সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যে দুইটি দক্ষিণবঙ্গে এবং একটি উত্তরবঙ্গে। প্রতিটি অফিসে ২৮টি করে মোট ৮৪টি বিভিন্ন ধরনের পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এছাড়াও মূল অফিসে ২১৩টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই পদগুলিতে ২০০৯ এবং ২০১০-এ রিটেনশন দেওয়া হয়। কিন্তু ২০১১ সালে সরকারের পরিবর্তনের পর সমস্ত নতুন পদগুলিকে বাতিল করে দেওয়া হয়।

তৃণমূল সরকার আসার পর থেকেই কমিশনের সঙ্গে একটা অসহযোগিতা এবং অনীহার সম্পর্ক তৈরি হয়। ২০১২ সালে তৃণমূল সরকার West Bengal Services (Recruitment to Clerical Cadres) Rules, 2010 (আদেশনামা নং, ৭১৬৫ এফ (পি), তাং ০১.০৭.২০১০) সংশোধন করে West Bengal Staff Selection Commission-কেও যখন পরীক্ষা নেওয়ার অধিকার দেয় তখনও পাবলিক সার্ভিস কমিশন তার বিরোধিতা করে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ৭১৬৫ এফ(পি), তাং ০১.০৭.২০১০ আদেশনামার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য সরকারের সব স্তরের করনিক পদে নিয়োগের পরীক্ষা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। তৎকালীন বিরোধীরা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে। ২০১১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর তৃণমূল সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে স্টাফ সিলেকশন কমিশনকেও যুক্ত করে। পরবর্তীতে ৭৬০০ এফ(পি) তাং-২০.০৯.২০১৩ এবং ৭৬২০ এফ(পি) তাং-২০.০৯.২০১৩ আদেশনামা জারি করে সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাত থেকে 'গ্রুপ বি' এবং 'গ্রুপ সি' পদের সব পরীক্ষা তুলে নিয়ে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের হাতে তুলে দিল। কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার যে বিপুল অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা তা রাতারাতি গড়ে তোলা যায় না। ফলে আংশিকভাবে কিছু পরীক্ষা নেওয়ার পরে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের কাছ থেকে পরীক্ষার দায়িত্ব আবারও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে ফিরে আসে (আদেশনামা নং-৫৭৫১ (এফ(পি) তাং- ১৩.০৯.২০১৭)।

কিন্তু ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ শুরু হয়ে গেছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে। শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ এবং আত্মীয়েরা কমিশনের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হতে শুরু করলেন। তাদের খবরদারির চোটে অনেক চেয়ারম্যান পর্যন্ত পদত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হলেন। এইরকম এক পরিস্থিতিতে ২০১৭ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দুর্নীতির ঘটনা জনসমক্ষে চলে আসে। অভিযোগ ওঠে যে জনৈক পরীক্ষার্থীর একটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর ০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬২ হয়েছে। এও অভিযোগ ওঠে যে ঐ পরীক্ষার্থী ডব্লিউ. বি. সি. এস. পরীক্ষার প্রিলিমিনারিতে প্রাথমিকভাবে সফল না হলেও, দ্বিতীয় একটি তালিকা প্রকাশ করে তাকে মেইন পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। ২০১৬ এবং ২০১৭ সালের আরও কয়েকজন পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওঠে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ২০২২ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সব বিডিওদের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ ওঠে তার মধ্যে এইসব বিডিওরাও ছিলেন। কিন্তু এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে পুরো দুর্নীতিটাই হয়েছিল রাজনৈতিক মদতে। সাধারণ কর্মচারীরা প্রথম থেকেই এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই হাইকোর্টে মামলা (PIL) চলছে প্রাক্তন কর্মচারীদের উদ্যোগে।

পি এস সি অফিসে বিক্ষোভ সভায় বলছেন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

রাজ্য সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার জন্য ২০১৬ সালে ৬৬৩৪-এফ(এইচ) তাং-২৬.১২.২০১৬ নামক একটি আদেশনামা জারি করে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে অর্থ দপ্তরের অধীনস্থ একটি সংস্থায় পরিণত করে যা সম্পূর্ণভাবে অসাংবিধানিক। এই আদেশনামায় কমিশন ১৯৫৩ সালে রচিত যে ৩২টি রেগুলেশন দ্বারা পরিচালিত হত তার সঙ্গে ৩৩ নং রেগুলেশন যুক্ত করে যাতে বলা হয়—"Notwithstanding anything contained elsewhere in this regulation, it is hereby declared that the State Government may, for the purpose of determining the number of members of staff of the Commission and their optimal utilisation, place the service of the officers or Staff of the Commission in such manner, and subject to such service conditions, as may be determined by the State Government from time to time"। সহজ বাংলায় এর অর্থ বেগড়বাই করলেই যেখানে খুশি পাঠিয়ে দেব। এই আদেশনামার বিরুদ্ধেও ইতিমধ্যে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবিধানের ৩১৫ থেকে ৩২৩ নং ধারায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের গঠন, কর্তব্য, আর্থিক সংস্থান, কার্যপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। এই সংস্থা মূলত সরকারী প্রশাসনের বিভিন্ন পদের জন্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি তৈরি করা, বিভিন্ন সরকারী পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করা, পদোন্নতির ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকারী সুপারিশের উপর পরামর্শ প্রদান করার কাজে যুক্ত থাকে। এই রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং কোনোরকম রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে অগ্রাহ্য করে সরকারী দপ্তরে নিয়োগের ব্যাপারে জনমানসে বিপুল আস্থা অর্জন করেছিল। এইরকম একটি সাংবিধানিক সংস্থায় কাজের ধরন অন্যান্য সরকারী অফিসের থেকে আলাদা। একদম প্রাথমিক স্তর থেকে কাজ শেখার মধ্য দিয়েই একজন দক্ষ কর্মচারী গড়ে ওঠেন। ফলে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উঠে আসা দক্ষ কর্মচারীদের অন্যত্র বদলির আদেশনামা আদতে কমিশনের দক্ষতাকে যে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, কোনও 'Public Interest' রক্ষা করবে না বরং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ধান্দা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে তা আমরা আগেই বলেছিলাম।

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎই মন্তব্য করলেন যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ হয় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সুপারিশে। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই মন্তব্য একেবারেই অনভিপ্রেত। এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সমস্ত অবরবর্গীয় পদে নিয়োগ হয় পাবলিক সাভিলস কমিশনের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই। এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় কর্মচারী মহলে। তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ হয় এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সারা কর্মচারী সমাজে। আর এর পরেই মাঠে নেমে পরে সরকারপন্থী সংগঠন। তারা কিছু হাস্যকর অভিযোগ তোলে কমিশনের কিছু সুদক্ষ কর্মচারীর বিরুদ্ধে। তারা নাকি অধিক সময় ধরে অফিসে থাকেন। তারপর গত ১৩.০৮.২৩ তারিখে একটি নির্দিষ্ট কাগজে তার সংবাদও পরিবেশন করানো হয়। এবং ১৮.০৮.২৩ তারিখে একটি আদেশনামা জারি করে একজন আধিকারিক সহ পাঁচজন কর্মচারীকে P&AR দপ্তরে স্থানান্তরিত করা হয়। পুরো ঘটনাটাই যে পূর্বপরিকল্পিত তা দুর্বল চিত্রনাট্য দেখেই বোঝা যায়। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরির জন্যই এই চিত্রনাট্য তৈরি করা হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে কমিশনের প্রায় সমস্ত কর্মচারীই বামপন্থী কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। ফলে সরকারপন্থী সংগঠনের এতে খুবই জ্বালা ধরেছে। এমন সব কর্মচারীদের স্থানান্তরিত করা হয়েছে যাদের মধ্যে কেউ নিজে ভয়ানক অসুস্থ অথবা কারোও বাড়িতে মা ক্যান্সারের রোগী।

কিন্তু কর্মচারীরা বিনা প্রতিবাদে এই অন্যায় মেনে নেয়নি। স্থানান্তরণের খবর পাওয়ার পরের দিনই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে সমস্ত কর্মচারীরা সেক্রেটারির ঘরের সামনে ধর্ণায় বসে পড়ে। সেক্রেটারিকে ডেপুটেশন দিয়ে বলা হয় যে এই কর্মচারীদের ছাড়া যাবে না। সেক্রেটারিও তাতে সহমত হন। কমিশনের কাজ সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত কর্মচারীদের গুরুত্ব লিখে তাদের ছাড়ার ক্ষেত্রে অপরাগতা জানিয়ে চেয়ারম্যানের চিঠি যায় অর্থ দপ্তরে। কিন্তু সিদ্ধান্ত যেহেতু রাজনৈতিক তাই চেয়ারম্যানের চিঠির পরেও একই সিদ্ধান্ত বহাল রাখে অর্থ দপ্তর এবং স্থানান্তরিত কর্মচারীদের ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেয়। এইভাবে একটি সাংবিধানিক সংস্থার উপর রাজ্য প্রশাসন জোর করে নিজের মত চাপিয়ে দেয় যা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। সংগঠন আবারও তীব্র প্রতিবাদ জানায়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে জমায়েত এবং সেক্রেটারির কাছে ডেপুটেশনের কর্মসূচী নেওয়া হয় পরের দিনই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতি এতো আক্রোশ কেন? শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী বা পৌরসভার কর্মী নিয়োগে যে দুর্নীতির জাল ছড়িয়েছে সারা রাজ্যজুড়ে সেই জাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ছড়ানো যায়নি। ছড়ানো যায়নি কমিশনের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন সাধারণ কর্মচারীদের আপোষহীন মনোভাবের জন্য। গত বছর করণিক পদে প্রায় ৭৫০০ জন সফল প্রার্থী নিযুক্ত হয়েছেন প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কোনওরকম দুর্নীতি ছাড়া। এছাড়াও মিসলেনিয়াস, আইসিডিএস, ফায়ার অপারেটর, এসআই (ফুড)-এরকম অনেক পদে নিয়োগ হয়েছে কোনোরকম দুর্নীতির আঁচড় ছাড়াই। ফলে অনেকেরই করেকম্মে খাওয়ার জায়গা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই লড়াইয়ের একেবারে সম্মুখভাবে রয়েছেন কমিশনের সাধারণ কর্মচারীরা। তাই তাদের উপর আক্রমণ নেমে আসছে। তাই এই মুহূর্তে আমাদের কাজ হল কমিশনের আক্রান্ত সমস্ত কর্মচারীদের পাশে দাঁড়িয়ে আক্রমণকে প্রতিহত করা। আমরা নিশ্চিত যে এই চক্রান্তের জাল আমরা ছিন্ন করতে পারবো। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদকের প্রেস বিবৃতি

আমাদের দেশের সংবিধানের ৩১৫ ধারায় রাজ্যে রাজ্যে পাব্লিক সার্ভিস কমিশন গঠন এবং স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসেবে এর কার্যাবলী নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ ও স্তরে যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত করার জন্যই সংবিধান প্রণেতারা পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পি এস সি-কে স্বাধিকার প্রদান করেছিলেন।

রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দাবি মেনে প্রশাসনের সর্বস্তরে পি এস সি-র মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। যোগ্যতার মাপকাঠিতে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগের জন্য যা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তনের পরে একদিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। যতটুকু চালু থাকে তা হয় সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ পদ্ধতিতে যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে, আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে। নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতিকে স্বাভাবিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য পি এস সি'র স্বাধিকারের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয় ২০১৬ সালে। অর্থ দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে পি এস সি-র মাধ্যমে চূড়ান্ত অস্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা হয়।

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বচ্ছভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের চাকরির দাবিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। পি এস সি দপ্তরের অভ্যন্তরে সংগঠনের নেতৃত্ব যখন স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন, তখন সংগঠনের নেতৃত্বদের দূর দূরান্তে বদলি করা হয় নেতৃত্বদের বদলী করে পি এস সি'র অভ্যন্তরে সংগঠিত শক্তিকে ভাঙা যাবে না। আমরা এই ঘৃণ্য পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করছি এবং অনতিবিলম্বে লোকসেবা আয়োগের স্বাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। বেআইনী বদলির আদেশনামাও রদ করার দাবি জানাচ্ছি।

তারিখ ঃ ২৬/১১/২০২৩

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

সমতার বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে অভিন্নতা কাম্য নয়

বছর বয়সের মধ্যে কোনও সন্তান জন্ম দিতে না পারে বা তার ৩০ বছর বয়সের মধ্যেও পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম হয় তবে তাঁর স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবে। আরও বলা আছে কোনো হিন্দু স্ত্রী ব্যভিচার করলে সেটা বিবাহ বিচ্ছেদের একটা ভিত্তি হবে। কিন্তু উল্টোটা হলে, অর্থাৎ স্বামী ব্যাভিচার করলে স্ত্রীর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিচ্ছেদের ভিত্তি হবে না। নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে সংঘ পরিবার ও কেন্দ্রের শাসক দলের কেন গোয়া সিভিল কোডের প্রতি এত দুর্বলতা। গোয়াতে এই মুহূর্তে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার। সেখানে কেন নারীদের প্রতি এই ধরনের কুৎসিত বৈষম্যমূলক আইন থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের আশু কাজ হওয়া উচিৎ, শুধু মুসলিম ব্যক্তিগত আইন নয় সব ব্যক্তিগত আইনগুলিতে নারীদের প্রতি যে বৈষম্য আছে তা দূর করে সমতা প্রতিষ্ঠা করা।

উপসংহার

ভারতের মতো বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহু জাতি, বহু সংস্কৃতির একটি বৈচিত্র্যময় দেশে ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে ভিত্তি করেই সংবিধান প্রণেতারা বিভিন্ন ধর্ম, গোষ্ঠী, পরিবার, ব্যক্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার প্রয়াস গ্রহণের পরামর্শও তারা সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে দিয়ে গেছেন। সে ক্ষেত্রেও ভারতের বাস্তবতায় তা বাধ্যতামূলক করেননি, বা তার জন্য কোনও সময়সীমাও নির্ধারিত করেননি। দেশের বর্তমান বাস্তবতায় গোষ্ঠী ও ধর্মমত নির্বিশেষে বিভিন্ন দেওয়ানি আইনের অবশ্যই সংস্কার প্রয়োজন। এই সংস্কারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নারীদের প্রতি বৈষম্যের অবসান এবং সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা। প্রয়োজন সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত এমন চালু আইনগুলির কঠোর প্রয়োগ। অভিন্ন যে আইনগুলি আছে সেখানেও প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে এবং তারও কঠোর প্রয়োগ করতে হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের উপর যৌন হয়রানি নিরোধক আইন ২০১৩-র সুরক্ষা অধিকাংশ কর্মরতা নারী পান না। এই ধরনের ক্ষেত্রগুলিতে কঠোর হওয়া প্রয়োজন।

সংঘ পরিবার সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের লক্ষ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে তাদের তুরূপের তাস করতে চায়। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভাজনের সবধরনের শক্তি আরও সক্রিয় হবে। এই শক্তি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি নস্যাৎ করতে চায়। প্রথাগত ঐতিহ্যের ধারনাটাকে এই শক্তি বাতিল করতে চায়। অভিন্ন ন্যূনতম বিধি প্রবর্তন উপলক্ষ্য মাত্র। আসল লক্ষ্য মুসলিম পার্সোনাল ল-কে আক্রমণ করা। এর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে তীব্র করে ঘোলা জলে মাছ ধরা।

নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী শক্তিগুলির সফ্ট টার্গেট এই মুহূর্তে সমাজের মধ্যবিত্ত অংশ। তাই মধ্যবিত্ত কর্মচারী হিসাবে আমাদের এই বিষয়ে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। সংগঠন-আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিপদের প্রসঙ্গও প্রচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু করতে হবে। বিভাজনের শক্তি আমাদের ঐক্যকে ভাঙতে চায় নানাবিধ প্রক্রিয়ায়। শুধু অভিন্ন ন্যূনতম বিধির বিষয় নয়, আরও নানা প্ররোচনামূলক বিষয় তারা বাতাসে ছড়িয়ে দেয় এবং দেবেও। যুক্তিনিষ্ঠভাবে তার বিরুদ্ধে সরব হতে হবে আমাদের। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

পালিত হল ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস

দরকার। কোনো এক বিশেষ সংজ্ঞার মধ্যে এই শব্দকে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। স্বাধীনতা এবং তার উদ্‌যাপন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা নয়। স্বাধীনতার অর্থ একদিক থেকে অকপট হওয়া, স্বাধীনতা মানে পরমত সহিষ্ণুতা প্রকাশ, স্বাধীনতার অর্থ মানবাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হওয়া। স্বাধীনতা যা বহন করে তা হল আত্মনির্ভরতা, সাহস এবং শক্তিমত্তা। স্বাধীনতা অন্বেষন করে সুন্দর ও মহত্তমকে। স্বাধীনতা এক মহৎ জীবনাদর্শ, স্বাধীনতা মানে এক লক্ষ্য।

অবিশ্বাস আর বিদ্বেষের রাস্তায় নয়, সমাজ পরিবর্তনের মূল ধারণাটি খুঁজতে হবে সামগ্রিকভাবে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিকে নজর দেওয়া সবিশেষ প্রয়োজন। খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের সার্বজনীন প্রসার। যে কথা একমাত্র বামপন্থিরাই সোচ্চারে বলেন। তাৎক্ষণিক বা সাময়িক কোনো সমস্যা নিয়ে বিচলিত হলে চলবে না। প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। কীভাবে এই সামগ্রিক পরিবর্তন করা সম্ভব তার উপায় নির্ধারণ করতে হবে দেশের জনগণকে। বামপন্থীদের এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তবেই প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদন লাভ সম্ভব।

এরপর আজকের আলোচনা সভার মূল বক্তা কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীন নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জী তার বক্তব্য উত্থাপন করেন। আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'স্বাধীনতার '৭৬-আক্রান্ত আধুনিক ভারত গঠনের ভাবনা'। প্রবীর মুখার্জী উপস্থিত সকলকেই অভিনন্দন জানান। দেশের ৭৭তম স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনানী ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারাকে ভাঙতে চাইছে আর এস এস-র নির্দেশে চলা কেন্দ্রের সরকার। এক স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী ব্যবস্থার কায়েম করা হচ্ছে। দেশের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানুষের জীবন জীবিকায় যে আঘাত নামানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে দেশের আপামর মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আধুনিক ভারত গঠনের ভাবনাকে প্রসারিত করতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে যারা লড়াই করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন এই স্বাধীনতাই কি তাদের কাঙ্খিত ছিল। আমাদের দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর ওপরে প্রতিদিন আক্রমণ করা হচ্ছে। তিল তিল করে লড়াই করে পাওয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব সবকিছু আক্রান্ত। দেশবাসী গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত। দারিদ্র্য, খাদ্যের অভাব, শিক্ষার অভাব, কাজের অভাব থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে অমৃত ভারতের স্বপ্ন ফেরী করা হচ্ছে। অমৃত বরষে সমস্ত মন্থনপর্ব জুড়ে কেবল গরল উঠে আসছে। ভারতীয় সংবিধানের উপর আক্রমণ এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও দেশের ভবিষ্যৎ ধ্বংস প্রতিহত করার চ্যালেঞ্জই আমাদের কাছে মুখ্য। সংবিধানের মূল চারটি স্তম্ভ --- ধর্মনিরপেক্ষ - গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, সামাজিক ন্যায় এবং আর্থিক সার্বভৌমত্ব আজ আক্রান্ত। সরকার আর আইন সভার কাছে দায়বদ্ধ নয়, গণতন্ত্রের উপর কার্যত বুলডোজার চলছে। বৈচিত্র্যের উপরে হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থানের একশৈলিক অস্তিত্বকে চাপিয়ে দিতে চাইছে সরকার ও রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে। যা আধুনিক ভারত গঠনের ভাবনাকে বিভাজন ও মেরুকরণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মণিপুরে তিন মাস ধরে বেনজির হিংসা। মহিলাদের নির্যাতনের ঘটনা 'ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে প্রকাশ্য এজলাসে সুপ্রিম কোর্টও বিবস্ত্র করেছে'। এই হল ন্যূনতম শাসন-সর্বোচ্চ নীরবতা। আমরা কি ভুলে যাব বাবরি ধ্বংস থেকে গুজরাটের গণহত্যা? মুজফ্‌ফরনগর থেকে সাম্প্রতিক হরিয়ানা? ওরা আমাদের প্রধান শত্রু বলে মনে করে। ওদের শত্রু হল দেশের বন্ধু। প্রকৃত দেশপ্রেমিক। আধুনিক ভারত গঠনের কারিগর। তাই ঐক্য সংহতি রক্ষায় এই ভয়ঙ্কর শক্তিকে রোখার জন্য দেশজুড়ে প্রচার ও জনগণকে সমবেত করার শপথ আজ এই দিনে আমরা গ্রহণ করলাম।

আলোচনা সভার সভাপতি মানস দাস, প্রবীর মুখার্জিকে অভিনন্দন জানান। সভায় উপস্থিত সকলকে পুনরায় অভিনন্দন জানিয়ে আলোচনা সভার কাজ শেষ করেন। সকলের কাছে তিনি অনুরোধ জানান যে আজকের তৃতীয় পর্বে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, পরিবার পরিজন সহ তা দেখে যাবার জন্য। □

সোমনাথ পোদ্দার

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

করতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেন স্বাধীনতার ৭৬তম বর্ষপূর্তিতে 'স্বাধীনতার ৭৬ ঃ আক্রান্ত আধুনিক ভারত গঠনের ভাবনা, শীর্ষক বিষয়ে জেলাস্তরে আলোচনা সভা সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসের মধ্যে করতে হবে। কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে এ বিষয়ে আলোচনা সভা ১৫ আগস্ট, ২০২৩ কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচক ছিলেন সংগঠনের প্রাক্তন সহ-সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী। আগামী ৩ নভেম্বর, ২০২৩ সাত দফা দাবির ভিত্তিতে সর্বভারতীয় সংগঠন আহুত দিল্লীর রামলীলা ময়দানে 'দিল্লী চলো' কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপক জমায়েত সংগঠিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে জেলাস্তরে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং পঞ্চায়েত স্তরের কর্মচারী সংগঠনগুলির মিলিত যৌথ কনভেনশন অনুষ্ঠিত করে কমিটি গঠনের মাধ্যমে ব্লকস্তর পর্যন্ত প্রচার কর্মসূচী রূপায়ন করতে হবে আগামী সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে। কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে যৌথ কনভেনশনে বিগত ১০ আগস্ট, ২০২৩ কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সি আই টি ইউ-র নেতৃত্ব ইন্দ্রজিৎ ঘোষ। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সামাজিক মাধ্যম সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে ওয়ার্কশপ কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী অক্টোবর, ২০২৩-এর মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভা জেলা / অঞ্চলে অনুষ্ঠিত করতে হবে। বিষয় ঃ সংগঠন-সংগ্রাম আন্দোলনের কয়েকটি বিশেষ প্রসঙ্গ। রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সব অংশের শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের সংগঠনগুলিকে নিয়ে বকেয়া আর্থিক ও অধিকারগত দাবি নিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচী জেলা ও কেন্দ্রীয় স্তরে নভেম্বর, ২৩-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জেলাস্তরে পরিবার-পরিজনকে যুক্ত করে আগামী ২২-২৩ নভেম্বর এই অবস্থান কর্মসূচী প্রতিপালিত হবে। কেন্দ্রীয় স্তরে আগামী ২৮-২৯ নভেম্বর কলকাতায় এই কর্মসূচী প্রতিফলিত হবে। জেলা ও কেন্দ্রীয় স্তরে এই কর্মসূচী সফল করতে এবং দিল্লী চলো কর্মসূচীকে প্রচারের শীর্ষে নিয়ে যেতে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবস) থেকে চার দফা দাবিতে জেলা শাসকের দপ্তরে (কলকাতার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান দপ্তরে) প্রচার সভা ও প্রতিটি কর্মচারীর কাছে পৌঁছে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করতে হবে। পরিবারের সদস্যদেরও এই কর্মসূচীতে যুক্ত করে আগামী ১০ অক্টোবর, ২০২৩-এর মধ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহ সমাপ্ত করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

সাংগঠনিক করণীয় বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, সদ্য সমাপ্ত রাজনৈতিক সংগ্রাম উত্তর পরিস্থিতিকে ভেদ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ব্যাপক অংশের কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে 'সদস্য সংগ্রহ অভিযান ২০২৩' এবং সকল স্তরের কমিটিকে সক্রিয় করার সাংগঠনিক দায়িত্ব সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচীতে যে নবীন অংশের কর্মচারীরা যুক্ত হয়েছেন, তাদের সংগঠনের অভ্যন্তরে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে হবে। চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের সংগঠিত করার কাজ বর্ধিত দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে। আগামী ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে মার্চ, ২০২৪-এর মধ্যে ১৬টি অন্তর্ভুক্ত সমিতি ও ১টি সহযোগী সমিতির রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন সফল করতে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে সহযোগিতা করতে হবে। রাজ্যের সর্বত্র ব্লক কমিটিগুলিকে সক্রিয় রাখার জন্য জেলাগতভাবে কর্মসূচী নিতে হবে। স্থানীয় আদায়যোগ্য দাবি নিয়ে জেলা / সমিতিস্তরে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পে উদ্ভূত জটিলতা কাটানোর দাবিতে কেন্দ্রীয়ভাবে ডেপুটেশনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। বিভিন্ন স্তরের অবসরপ্রাপ্ত নেতৃত্ব-কর্মী-কর্মচারীদের নামের তালিকা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির কাছে প্রেরণ করতে হবে। সর্বভারতীয় সংগঠনের জাতীয় কাউন্সিল সভা আগামী ২৮-৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। উদ্যোক্তা সংগঠন হিসাবে বর্ধিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। সর্বভারতীয় কাউন্সিল সভাকে সার্বিক সফল করার লক্ষ্যে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হবে আগামী ৩০ জুলাই, ২০২৩। সংগ্রামী হাতিয়ার ও এমপ্লয়িজ ফোরামের গ্রাহকভুক্তর কাজে বর্ধিত গুরুত্ব দিয়ে সম্পন্ন করতে হবে। একই সঙ্গে গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট সময়ে পত্রিকা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আরও যত্নবান হতে হবে। গ্রাহককে পাঠকে পরিণত করার লক্ষ্যে সংগ্রামী হাতিয়ার নিয়ে আলোচনা সভা পুনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একটি জেলা পূর্ব বর্ধমান ধারাবাহিকভাবে পাঠ সভা সংগঠিত করে চলেছে। অন্য জেলাগুলোকেও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবেও দুর্বলতা কাটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে তহবিল সংগ্রহের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানের বহুমাত্রিক আক্রমণের মোকাবিলা করতে প্রয়োজন বহুমুখী কর্মসূচী, বহুমুখী আন্দোলন। বামপন্থীদের দায়িত্ব সংসদ বহির্ভূত আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই কর্মচারী সমাজকে আরও ঐক্যবদ্ধ করাই আমাদের কর্তব্য।

সাধারণ সম্পাদকের প্রারম্ভিক প্রস্তাবনার পরবর্তীতে ২১টি জেলা, কলকাতার ৬টি অঞ্চল এবং ৪টি সহযোগী সমিতির পক্ষ থেকে ৩১ জন পরিস্থিতি ও সংগঠন বিষয়ে তাদের মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেন। সমগ্র আলোচনাকে সূত্রায়িত করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায় বলেন পরিস্থিতির নিরিখে সব কাজটাই খুব কঠিন কাজ। কঠিন সময়ের কাজ। Untraveled Path-এ পদচারণা করছি আক্রমণের নানা রূপ, আঙ্গিক। বদলী-মানসিক উৎপীড়ন / চাপ, বিভিন্ন ধর্মী আক্রমণ। একে প্রতিহত করতে সংঘর্ষে যেতে হবে, সমস্যাকে মোকাবিলা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। রাস্তায় আমরা আছি বলেই আমরা এগিয়ে চলেছি। সম্মিলিত প্রয়াসে সাফল্য অর্জন আমরা করতে পারি তা ১০ মার্চ দেখিয়েছি। এক্ষেত্রে পরিবারেরও ভূমিকা ছিল। কিন্তু সাফল্যের মধ্যেও ত্রুটি আছে তা কাটাতে হবে। সমিতি / কো-অর্ডিনেশন কমিটি নয় যে যেখানে আমরা অবস্থান করছি সব কাজ সকলকে নিষ্ঠার সাথে করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষ গণতন্ত্রের পতাকা তুলে ধরেছেন। আমরাও করার চেষ্টা করছি। আমরা সঠিক পথে রয়েছি বলেই পুঁজিবাদ যেমন প্রতিনিয়ত কমিউনিজমের ভূত দেখে, তেমনি আমাদের রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ঃশই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ভূত দেখছেন। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা যেন সর্বদা রক্ষিত হয়। আমাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসকে মাথায় রেখে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে চার দফা দাবিতে যে স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচী আমরা শুরু করব, তাতে সমস্ত কর্মচারীর কাছে পৌঁছোতে হবে। 'Reach to each' স্লোগান-এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। কর্মচারীর কাছে শুধু যাওয়াই নয়, সম্পর্ক তৈরি (Relation Build up) করতে হবে। অরাজকতার বিরুদ্ধে কর্মচারী সমাজকে আবৃত করতে হবে। আন্দোলনের বৃত্তকে (Space) বাড়াতে হবে। কেন্দ্রীয় স্তর থেকে সমিতির জেলাকে মনিটরিং করতে হবে। জেলা / অঞ্চলে ভূমিকা প্রতিপালনে গাইড করতে হবে। ১১-১৮ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন সমিতির যৌথ সফরসূচী থেকে সাফল্যকে সংহত করতে হবে। পত্রপত্রিকার গ্রাহকভুক্তি থেকে ১২ই জুলাই কমিটির তহবিল সংগ্রহ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে হবে। বিভিন্ন সমিতির কর্মসূচীতে অন্য ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনকে যুক্ত করতে হবে। ১২ই জুলাই কমিটি সহ বিভিন্ন যৌথ কর্মসূচী প্রতিপালনে আরও আন্তরিক হতে হবে। বিভিন্ন দপ্তরে স্বল্প হলেও নতুন নিয়োগ হয়েছে। নবনিযুক্ত কর্মচারীদের সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগ বাড়াতে হবে। বিগত দিনে সংগঠনের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে এই কর্মসূচী করা হত, কঠিন সময়ে কিছুটা আলগা হয়েছে। কিন্তু আমাদের পুরনো ছন্দে ফিরতেই হবে। এটা আমাদের টাস্ক, সমস্ত ফাঁকফোকর মেরামত করতে হবে। ২৮-৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩ গোটা ভারতের মিলনস্থল হবে AISGEF-এর National Council। গোটা দেশ এক ভয়ঙ্কর অবস্থার মুখোমুখি, অমৃত মহোৎসবের নামে ৩৩ লক্ষ কোটি টাকা লুঠ চলছে। একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা বিক্রি হচ্ছে। আমার, আপনার, জনগণের করের টাকা থেকে কর্পোরেটদের ১৫ লক্ষ কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ মকুব করা হয়েছে। মণিপুরের ভয়ঙ্কর ঘটনা তিন মাস সামনে আসতে দেওয়া হয়নি। গান্ধী শান্তি পুরস্কার পাচ্ছে গীতা প্রেস, যারা ১০০ বছর ধরে মনুবাদ, হিন্দুত্ববাদ প্রচার করছে। যারা গান্ধী হত্যার জন্য দায়ী। এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে লড়াইয়ের বৃহত্তর ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে লড়াই চলছে। আগামী ৩ নভেম্বর '২৩ দিল্লীর বুকে শ্রমজীবী মানুষের ক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়বে। পশ্চিমবঙ্গেও শাসকদলের শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর লুঠেরাদের রক্ষা করার বিষয়টি বারে বারে প্রকাশ হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে মানুষ লড়াই করছেন। মানুষ মুক্তি চাইছেন। কর্মচারীদের মনের মধ্যেও আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ক্ষত হয়েছে, দগদগে ঘা রয়েছে, এর নিরাময়ে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে আমাদের অবস্থান আরও দৃঢ় করতে হবে। একই সঙ্গে কর্মচারীদের সঙ্গে জীবন্ত যোগাযোগে আরও যত্নশীল হতে হবে। আমাদের পজিটিভ দিকেই এগোতে হবে। Depoliticalization-এর বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে।

রাজ্য কাউন্সিল সমগ্র আলোচনাকে উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যরা গ্রহণ করার পরবর্তীতে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে মানস দাস সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

দেবাশীষ রায়

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

কমরেড প্রশান্ত সাহা

আন্দোলনে যুক্ত হন। এবং ধীরে ধীরে নিজ সমিতি এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বোচ্চ নেতৃত্বে আসীন হন।

কমরেড প্রশান্ত সাহা ছিলেন রাজ্যের সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনী নেতা। তিনি ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ সভাপতি এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি সরকারী কর্মচারী সমিতির বর্তমান সভাপতি এবং প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক।

২০১৮ সালে নভেম্বর মাসে নবান্নের ভিতরে টিফিন বিরতিতে মহার্ঘভাতার দাবিতে বিক্ষোভ দেখানোর জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যে ১৫ জন প্রথম সারির নেতাকে দূর-দূরান্তে প্রতিহিংসাপরায়ন, অনৈতিক বদলি করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমরেড প্রশান্ত সাহা। তাঁকে মুর্শিদাবাদ জেলায় বদলি করা হয়েছিল। দীর্ঘ চার বছর সেখানে থাকার পর তাঁকে পুনরায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের দপ্তরে ফিরিয়ে আনা হয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা নিয়ে মেহনতি মানুষের স্বার্থে ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ, পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি সরকারী কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয়দেব হাজরা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণ সভা ঃ গত ৮ নভেম্বর '২৩ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ ডি সরকারী কর্মচারী সমিতির যৌথ উদ্যোগে কমরেড প্রশান্ত সাহার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় স্মৃতিচারণা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ ডি সরকারী কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয়দেব হাজরা এবং কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা প্রবীর মুখার্জী। □

সুকান্ত চৌধুরী

প্রয়াত কমরেড সমীর ভট্টাচার্য্যকে শ্রদ্ধায় স্মরণ

বিগত ২২ আগস্ট ২০২৩ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (WBMOA) এবং ১২ই জুলাই কমিটির উদ্যোগে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মানস দাস (রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি), প্রণব দাস এবং মনোজ সাউ (১২ই জুলাই কমিটি)-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। প্রথমেই শোক প্রস্তাব পাঠ করেন মানস দাস এবং নীরবতা পালন করা হয়। এই স্মরণসভা শুরু হয় কমরেড সমীর

স্মৃতি চারণা করছেন ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য

ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়, রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অভীক সেনগুপ্ত, প্রাক্তন দুই সাধারণ সম্পাদক (WBMOA) সুজিত দাশগুপ্ত ও দেবলা মুখার্জী প্রমুখ।

তাঁর স্মৃতিচারণায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, কর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রিয় নেতা। রাজ্যস্তরের ক্ষেত্রে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল অপরিসীম। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন মত ও পথের নেতৃবৃন্দকে একই সূত্রে গেঁথে একই মঞ্চে তাঁদের সংগঠিত করেছিলেন তিনি। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মঞ্চ তথা আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তিনি ছাত্রাবস্থায় পরিচিত ছিলেন একজন সাংস্কৃতিক নেতা হিসাবে। সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল বিশাল। তাঁর মাধ্যমে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বর্তমানে এখন লড়াই-আন্দোলন অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। আক্রমণ চারিদিক থেকে বেড়েই চলেছে। ভাষাগত আক্রমণ, সাংস্কৃতিক জগতে আক্রমণ, মনোজগতে আক্রমণ একদিকে, অন্যদিকে কর্মচারীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আবার এই সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদও সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং বর্তমান সময়ে আরও বেশি বেশি করে লড়াই-আন্দোলন করতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। তবেই কমরেড সমীর ভট্টাচার্যের অপূরণীয় কাজ কিছুটা হলেও পূরণ করতে পারা যাবে।

সাধারণ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (WBMOA) অভীক সেনগুপ্ত বলেন মতাদর্শ চেতনাকে শানিত করার জন্য তিনি উৎসাহ দিতেন। আজকের এই কঠিন পরিস্থিতিতে শুধু শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলন নয়, সমাজ বদলের লড়াই করতে কমরেড সমীর ভট্টাচার্যর শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন সমিতির শতবর্ষের সূচনা এবং সমাপ্তি কিভাবে গৌরাবান্বিত করা যায় তার সুচিন্তিত পরামর্শ ও বাস্তবায়িত রূপ দিয়েছিলেন কমরেড ভট্টাচার্য্য। সমিতির মুখপত্র 'সমন্বয়'-র সাথে সম্পর্ক ছিল নাড়ির মতো। তিনি 'সমন্বয়' পত্রিকাকে অভিভাবকের মতো লালন পালন করতেন।

স্মরজিৎ রায় চৌধুরী প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি স্মৃতিচারণা করে বলেন, একজন অভিভাবক ও প্রিয় মানুষকে হারালাম। আন্দোলন কর্মসূচী সংগঠিত করার ভূমিকা ছিল বিশাল। তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে পাথরের মতো ভারি। ব্যবহারিক জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ মানের। তাঁর অপূরণীয় কাজ আমাদের সমাপ্ত করতে হবে, তবেই হবে তাঁর স্মরণ সভার আসল সম্মান। লেখক-শিল্পী সাংস্কৃতিক জগৎ সম্পূর্ণভাবে রপ্ত করেছিলেন। কর্মচারী আন্দোলনে বিশাল ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর অভাব অনুভব করছেন সবক্ষেত্রেই। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা ছিল। শ্রমিক শ্রেণীর মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ-সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী বলেন, সকলের প্রিয় মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের এক নেতা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। প্রয়াত কমরেডের ইতিবাচক দিকগুলো কিভাবে ব্যবহার করব, সেটা আমাদের শিখতে হবে। আমাদের অভিভাবক ছিলেন। মানুষ 'মরণশীল', জন্মিলে মরিতে হবে। অনেক মৃত্যু পরিবারও স্মরণ করে না। আরও বলেছেন, কোনো কোনো মৃত্যু 'পাখির পালকের' মতো, আবার কিছু মৃত্যু আমাদের কাছে 'পাথরের' মতো। তিনি নানা সঙ্কটের মধ্যেও আলোর দিশা খুঁজে বের করতেন। তাঁরা একটা স্বপ্ন নিয়ে কাটিয়েছেন। স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে গেছেন। বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা, শ্রেণীভিত্তিক সমাজ, শোষণ থাকবে না---কাজ করে গেছেন। কিছুটা হলেও রূপায়িত করেছেন। কর্মচারীদের দপ্তরগুলোতে নতুন ভাবে আক্রমণ আসছে। তিনি সবসময় সরলভাবে বলেছেন, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করে নিচ্ছে আমাদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। লড়াই-আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এই সময় সমীর ভট্টাচার্যের মতো নেতা দরকার ছিল। ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তুলতেই।

জয়দেব দাশগুপ্ত সম্পাদক BEFI পশ্চিমবঙ্গ, স্মৃতিচারণায় বলেছেন, তাঁদের সংগঠন ১২ই জুলাই কমিটির অন্তর্ভুক্ত না হলেও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় আন্দোলনের সূত্রে পরিচয় ঘটে। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুব সহজেই করে দিতেন। বন্ধুসুলভ ব্যবহার করতেন। কঠিন দিন। সারা পৃথিবীতে কর্মচারী আন্দোলন-অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন। স্থায়ী কর্মচারী কমছে, অস্থায়ী কর্মচারী বাড়ছে। ব্যাঙ্কের কোনো সমস্যা হলে, সংগঠন আলাদা হলেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিতেন।

কমরেড সমীর ভট্টাচার্যের স্মরণ সভায় ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য গভীর শোক জানিয়ে বলেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা একজন অভিভাবককে হারালাম।

১৯৯৯ সালে নজরুল মঞ্চে কমরেড সমীর ভট্টাচার্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং ২০০৪ সালে পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলন থেকে যুগ্ম-সম্পাদকের পদে আসীন হন এবং ২০০৭ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ঐ দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালে তাঁর কাঁধে বর্ধিত দায়িত্ব অর্পিত হয় ও তিনি ১২ই জুলাই কমিটির সপ্তম সাংগঠনিক কনভেনশন থেকে অন্যতর যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত নবম রাজ্য সাংগঠনিক কনভেনশন পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন এবং যৌথ আন্দোলনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ কমরেড সমীর ভট্টাচার্য একজন সুবক্তা ও সুলেখকও ছিলেন। 'সমন্বয়', 'সংগ্রামী হাতিয়ার' সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর লেখনী মধ্যবিত্ত কর্মচারী শিক্ষক আন্দোলনের কর্মী-সংগঠকদের সমৃদ্ধ করেছে। প্রয়াত কমরেড ভট্টাচার্যর পরিবারে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা। সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।

কমরেড ভট্টাচার্য্যর ভাই নির্মল ভট্টাচার্য স্মৃতি চারণা করতে গিয়ে বলেন, তিনি শুধু আমার দাদা ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন আমার শিক্ষাগুরু, রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক এমনকি কর্মজীবনেও আমাদের প্রিয় নেতা। তাঁর অভাব সবসময় অনুভব করব। পরিবারের উদ্যোগে গত ৩০/৭/২৩ এলাকায় স্মরণ সভা করা হয়।

স্মরণ সভায় সভপতি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, মানস দাস বলেন বর্তমানে দেশের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর প্রয়ান নিশ্চিতভাবেই এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করল। তাই এই স্মরণসভা প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করছে। **কমরেড সমীর ভট্টাচার্য অমর রহে, কমরেড সমীর ভট্টাচার্য্য লাল সেলাম।** আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে স্মরণ সভার সমাপ্তি ঘটে। □

সুকান্ত চৌধুরী

শোক সংবাদ

নির্মল আচার্য

বাঁকুড়া জেলা কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, বাঁকুড়া জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির (WBMOA) প্রাক্তন জেলা সম্পাদক ও সভাপতি, রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি, বাঁকুড়া জেলা শাখার উপদেষ্টা কমরেড নির্মল আচার্য ৮৭ বছর বয়সে বেসরকারী হাসপাতালে ৯.৫০ মিনিটে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। কিছুদিন আগে অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। নার্সিংহোম থেকে তার মরদেহ সমিতি দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তার মরদেহে শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দ, কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্বগণ সহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব সহ সাধারণ কর্মচারীরা শ্রদ্ধা জানান। তারপর তাঁর মরদেহ কর্মচারী নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দান করা হয়। এর পূর্বে তাঁর চোখ দান করা হয়।

কমরেড নির্মল আচার্য অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরে ১৯৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের পর ছিন্নমূল হয়ে পরিবারের সকলে বিচ্ছিন্নভাবে এই রাজ্যে চলে আসেন। চাকুরি জীবনে প্রথমে মুহুরীর পদে ১৯৫৫ সালে ১ সেপ্টেম্বর সেটেলমেন্ট দপ্তরে জে এল আর ও, জি ঘাটি দপ্তরে যোগদান করেন। পরে সারেঙ্গা, জয়পুর, বিষ্ণুপুর হয়ে ১৯৭৮ সালে করনিক পদে বাঁকুড়া কালেক্টরেটে যোগদান করেন। ১৯৯৪ সালে উচ্চবর্গীয় করনিক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। সংগঠনের নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে জরুরি অবস্থার সময় বিষ্ণুপুরে অফিসের মধ্যেই দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত ও রক্তাক্ত হন এবং মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার হন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি সংগঠনের সমস্ত কর্মসূচীতে তাঁর অংশগ্রহণ বর্তমান প্রজন্মের কাছে শিক্ষনীয় ছিল। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি বাঁকুড়া ছেড়ে তাঁর আত্মীয়দের কাছে চলে যাননি। জেলার কর্মচারীদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল প্রবল।

স্মরণ সভাঃ গত ১৯ নভেম্বর '২৩ বাঁকুড়ার সমিতিভবনে কমরেড নির্মল আচার্যের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মৃতিচারণা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিদ্যুৎ দাস, জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক মনোজ ব্যানার্জী, কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা প্রণব মুখার্জী প্রমুখ। □

এম এস স্বামীনাথন

প্রয়াত হলেন 'সবুজ বিপ্লবে'র জনক এম এস স্বামীনাথন। ২৪ সেপ্টেম্বর '২৩ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা বেজে ২০ মিনিটে চেন্নাইয়ে। বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুখে তিনি আক্রান্ত ছিলেন বেশ কয়েক বছর যাবৎ। স্বামীনাথনের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বিজ্ঞানী মহল ও আপামর মানুষ।

১৯২৫ সালের ৭ আগস্ট তামিলনাড়ুর কুম্বাকোনমে জন্ম হয়েছিল এম এস স্বামীনাথনের। দীর্ঘদিন কৃষি গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। মূলত মিশ্র চাষ, চাষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার, ফসলে শঙ্কর প্রজাতির ব্যবহার নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন তিনি। ধানের নতুন নতুন প্রজাতির আবিষ্কারের জন্য গোটা বিশ্বে স্বীকৃত স্বামীনাথন। ছয়ের দশকে সবুজ বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তিনিই। স্বামীনাথনকেই ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয়।

কৃষিবিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৮৭ সালে প্রথম বিশ্ব খাদ্য পুরস্কারে স্বামীনাথনকে ভূষিত করা হয়। এছাড়া ১৯৭১ সালে তিনি ম্যাগসেসে পুরস্কার এবং ১৯৮৬ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বিশ্ব বিজ্ঞান পুরস্কার পান। ৩ বার পদ্মভূষণ পুরস্কারেও সম্মানিত করা হয় তাঁকে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানের জনক। ফলে কৃষি বিজ্ঞানে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

ভারতীয় কৃষিতে ডঃ স্বামীনাথনের রূপান্তমূলক প্রভাব ১৯৬০-এর দশকে আবির্ভূত হতে শুরু করে যখন তিনি উচ্চফলনশীল ফসলের জাত প্রবর্তনের পক্ষে ছিলেন। তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি এমন এক সময়ে ভারতে সবুজ বিপ্লবের অগ্রদূত হিসাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল, যখন দেশ দারিদ্র এবং সামাজিক সুরক্ষার অভাবের সাথে লড়াই করছিল।

কৃষি অর্থনীতিবিদ কিংবা কৃষি বিজ্ঞানী হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতিপ্রাপ্ত স্বামীনাথনের মূল্যবান অবদান যেমন খাদ্যশষ্যের ক্ষেত্রে পরনির্ভরতা কমিয়ে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে দেশকে আত্মনির্ভর করে তোলা, তেমনই স্বামীনাথন কমিশনের রিপোর্টে ছিল কৃষি ব্যবস্থার মোড় ঘুড়িয়ে দেওয়ার মতো এক গুচ্ছ সুপারিশ। তাঁর সুপারিশ যদি রূপায়িত হত তবে দেশে কৃষকদের এতটা সঙ্কটের মুখে পড়তে হত না কিংবা ফসলের দামের অভাবে আত্মহত্যার মতো চরম পথও বেছে নিতে হত না বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

কৃষিক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করতে গেলে অধিকাংশই 'সবুজ বিপ্লব'র কথা বলে থাকেন। গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেশের বছরের পর বছর খাদ্য সঙ্কট ভাবিয়ে তুলেছিল রাজনীতিবিদ থেকে কৃষিবিজ্ঞানীদের। সেই সময়ে ভারত খাদ্যশস্য উৎপাদনে পিছিয়ে, ফলে দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানির ওপরেই বেশি নির্ভরশীল ছিল। তাঁর গবেষণালব্ধ রাসায়নিক জৈব প্রযুক্তির অস্ত্র গ্রহণ করে গম ও ধান উৎপাদনের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে।

তবে স্বামীনাথন কৃষিবিজ্ঞানী না হয়ে পুলিশ অফিসারও হতে পারতেন। চারের দশকের শেষদিকে পুলিশের নিয়োগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়েছিলেন তিনি। শেষপর্যন্ত ওই পথে না গিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন উচ্চশিক্ষায়। স্বামীনাথনের বাবা এম কে শম্ভাশিবম ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত শল্য চিকিৎসক। মায়ের নাম পার্বতী মাঙ্গালম। গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষে তিনি কৃষিবিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আবার বাবার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণও তাঁকে সমানভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর শিক্ষার ঝুলিতে দুটি স্নাতক ডিগ্রি রয়েছে। তার মধ্যে একটি কোয়েম্বাটোরের কৃষিবিজ্ঞান কলেজ থেকে প্রাপ্ত। ১৯৪৯ সালে নয়াদিল্লীর 'ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট' থেকে স্নাতকোত্তর করেন সাইটোজেনেটিক্স-এ। ডক্টর অব ফিলোজফি ডিগ্রি পান কেম্ব্রিজ থেকে। সেখানেই আলাপ হয়েছিল তাঁর স্ত্রী মীনা স্বামীনাথনের সঙ্গে। ১৯৫৪ সালে পোস্ট ডক্টরেট হন উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ছিলেন। ১৯৭৯ সালে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ'-এর ডিরেক্টর জেনারেল হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচ মন্ত্রকের প্রিন্সিপাল সচিব পদে ছিলেন। কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনে কিছুকাল ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

১৯৮২ থেকে ১৯৮৮ ফিলিপাইন্সের ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রধান ছিলেন স্বামীনাথন। এই সময়কালে দেশ-বিদেশের বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হন তিনি। ১৯৮৭ সালে তিনিই প্রথম যিনি 'বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার' এবং একইভাবে প্রথম বিদেশী হিসাবে ফিলিপাইন্সের 'গোল্ডেন হার্ট প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড' পান। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ সম্মান পাওয়ার পর ১৯৮৯ সলে পদ্মবিভূষণে ভূষিত হন স্বামীনাথন। বিশ্ব খাদ্য পুরস্কারের প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে চেন্নাইয়ে ১৯৮৯ সালে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার দেশে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটিয়ে জীবন ও জীবিকার উন্নতির লক্ষে গড়ে তোলেন 'এম এম স্বামীনাথন রিসার্চ ফাউন্ডেশন'। ২০১৮ সালে বিশ্ব কৃষি পুরস্কার পান তিনি। ২০০৯-২০১৩ পর্যন্ত রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন।

তাঁর তিন কন্যা বর্তমান। তিন কন্যাই কৃতী সন্তান। সৌম্যা স্বামীনাথন ছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্কৃতির মুখ্য বিজ্ঞানী পদে। আরেক কন্যা মধুরা স্বামীনাথন বেঙ্গালুরু 'আই এস আই'র অর্থনৈতিক বিশ্লেষক বিভাগের অধ্যাপক এবং নিত্যা রাও ব্রিটেনের ইস্ট অ্যাঙ্গিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এন আই এস ডি'র অধিকর্তা। □

সুকান্ত চৌধুরী

ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টস সমিতির কর্মসূচী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা রাজ্য কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এবং সমিতির স্বাধীন নিজস্ব কর্মসূচী হিসাবে গত ২৯ আগস্ট ২০২৩ ক্যাডারগত দাবি দাওয়ার সমাধানের লক্ষ্যে ও. বে. ভেটেরিনারি এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের প্রাণী সম্পদ ভবন অভিযানের কর্মসূচী এক উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কর্মসূচী শুরুর বহু আগে থেকেই শাসকশ্রেণীর পুলিশ বাহিনী পুরো প্রাণীসম্পদ ভবন ঘিরে রেখেছিল। পুলিশ ফেস্টুন ছিঁড়ে দিয়েছিল, পরে কর্মচারীদের মেজাজের কাছে পুলিশ হার মানে এবং ফেস্টুন ক্যাম্পাসের বাইরে এনে লাগাতে সাহায্যের হাত বাড়াতে বাধ্য হয়।

ভেটেরিনারি ফার্মাস্টি সহ, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমিতি, লবণহ্রদ অঞ্চল, আধিকারিকদের সংগঠন সম্মিলিত ভাবে দুই শতাধিক কর্মচারী অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। প্রাণী সম্পদ ভবন চত্বর স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত ছিল। পুলিশের সাথে নেতৃবৃন্দের উত্তপ্ত বাক্‌বিতণ্ডায় অভিযানের গুরুত্ব অনেকটাই বৃদ্ধি পায়।

মাননীয় শ্রী সব্যসাচী চ্যাটার্জী, বিশিষ্ট আইনজীবী, কলকাতা হাইকোর্ট, সমাবেশে উপস্থিত থেকে শাসক ও পুলিশের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। কর্মচারীদের এই আন্দোলনকে কুর্ণিশ জানান। কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার বঞ্চনা সহ আক্রমণের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অভিজিৎ দাস, সম্পাদক লবণহ্রদ অঞ্চল, কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে যান রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনাথবন্ধু মণ্ডল এবং বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী প্রশাসনের নক্কারজনক ভূমিকা, প্রতিহিংসা পরায়ণ বদলী প্রসঙ্গে ও আর্থিক বঞ্চনা সহ নানাবিধ বিষয় জমায়েতে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীদের সামনে তুলে ধরেন।

একই দিনে কলকাতা কর্মচারী ভবনে সমিতির ৫০ বছর উদ্‌যাপন ও ১৮তম ফার্মাসিস্ট ডে ২০২৩ প্রতিপালন করা হয়। ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য সমিতির ৫০ বছর পথ পরিক্রমা আন্দোলনের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি উল্লেখ করেন।

১৮ তম ফার্মাসিস্ট ডে '২৩ উপলক্ষে প্রফেসর তাপস কুমার সুর, কোর্স ডিরেক্টর ডি.ভিপি. কোর্স ও প্রফেসর প্রদীপ কুমার দাস, অধ্যাপক প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাণী সম্পদের উপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অনাথবন্ধু মণ্ডল। অনুষ্ঠানে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। পরিবার পরিজনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সফল ও সার্থক কর্মসূচী ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবে এই করাই যায়।

সমগ্র কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়, সভাপতি, দেবব্রত দরবার এবং অনন্দ উখাসনি, সহ-সভাপতি। □

ত্রুটি সংশোধনী

পত্রিকার মে-জুন, ২০২৩ সংখ্যায় কমরেড শম্ভু চক্রবর্তীর শোক সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্যগত কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। সেগুলির সংশোধন করছি। মৃত্যুকালে কমরেড শম্ভু চক্রবর্তীর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। উনি ১২ই জুলাই কমিটিতে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা পালন করলেও জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক কখনো ছিলেন না। একটি জায়গায় 'অবিভক্ত দিনাজপুর' লেখা হয়েছে, সঠিক হবে 'অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর'। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখপ্রকাশ করছি।

—পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
51st Year, 3rd & 4th Edition, July-August 2023
Regd. No. : 18484/71

৩ নভেম্বর ২০২৩ নয়া দিল্লীতে ঐতিহাসিক সমাবেশ

বিগত ৩ নভেম্বর '২৩ নয়াদিল্লীর রামলীলা ময়দানে রাজ্য সরকারী ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, শিক্ষকদের

বক্তব্য রাখছেন বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

কেন্দ্রীয় মহা সমাবেশ (চেতাবনী সমাবেশ) অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছয় শতাধিক কর্মচারী, পেনশনার্স নয়াদিল্লীতে উপস্থিত হন। নিউ দিল্লী রেল স্টেশনের আজমের গেট থেকে ফেস্টুন, ব্যানার সজ্জিত, স্লোগান মুখর মিছিল করে রাজ্য কর্মচারী ও পেনশনার্সরা রামলীলা ময়দানে সমাবেশে যোগ দেন। সমাবেশের মূল বক্তা ছিলেন সি আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেন। পশ্চিমবঙ্গের থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। বিভিন্ন রাজ্যের কর্মচারী, শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্ব ও সর্বভারতীয় নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন।

এই সর্বভারতীয় সমাবেশের পূর্বেপ্রতিটি রাজ্যে যৌথ কনভেনশন হয়। ৩ নভেম্বর ২০২৩ সর্বভারতীয় সংগঠন আহুত দিল্লী চলো কর্মসূচীর সমর্থনে এক যৌথ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে। যৌথ কনভেনশনের মূল আয়োজক ছিলেন কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত যৌথ কমিটি। ১০ আগস্ট, '২৩ বিকাল ৫.৪৫-এ শুরু হওয়া এই কনভেনশন পরিচালনা করেন মনিকা মজুমদার (কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি) মানস দাস (রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি) ও সমীর গিরি (পঞ্চায়েত যৌথ কমিটি)-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভায় প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা পেশ করেন কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে রূপক মুখোপাধ্যায়। ৭ দফা দাবি উত্থাপন সহ তিনি ৩ নভেম্বরের কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে আগামী দিনে সমস্ত জেলায় এই যৌথ কনভেনশন সংগঠিত করার আহ্বান জানান। যৌথ কনভেনশনের মুখ্য বক্তা সি আই টি ইউ-র নেতৃত্ব ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন গোটা দেশজুড়েই শ্রমজীবী-মেহনতীর ওপর আক্রমণ বাড়ছে আর আমাদের রাজ্যে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সর্বস্তরে দুর্নীতি, লুঠ। সারা দেশ তথা পৃথিবীর অর্থনীতি দক্ষিণপন্থার দিকে শিফ্‌ট করছে। ধান্দার ধনতন্ত্র আসলে কর্পোরেট লুঠ, রেল, টু-জি বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে মূল্য ঠিক করার দায়িত্ব যে কমিটির ওপর ন্যস্ত, তারাই দুর্নীতিতে যুক্ত। ৫০ কোটি টাকার সম্পত্তিকে ৫ কোটি টাকা দেখিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। বড় বড় আধিকারিকরা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা দরকার রেলে বেসরকারীকরণ শুরু হয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময়ে যে সরকারের রেলমন্ত্রী ছিলেন মমতা ব্যানার্জী। সরকারী সম্পদকে বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতা-আমলা কর্পোরেট Nexus চলছে। সংবিধানের কাঠামোর ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, Judiciary-কেও ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির নামে সিলেবাসের পরিবর্তন করা হচ্ছে আর এস এস-এর লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে। দেশের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতীর অবস্থা একটি তথ্যেই পরিষ্কার, যখন তথ্যে দেখা যায় দেশের ৯০ শতাংশ সম্পদ দেশের মাত্র ১ শতাংশ মানুষের হাতে। আর বাকী ১০ শতাংশ সম্পদ দেশের বাকী ৯৯ শতাংশ মানুষের হাতে। সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে প্রতিটি মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান স্বাস্থ্য শিক্ষার দাবিতে শ্রমিক কর্মচারীদের ৩ নভেম্বর দিল্লী চলো কর্মসূচীকে সফল করতে আপনাদের উদ্যোগ অভিনন্দনযোগ্য। দেশ ও রাজ্যে সরকারী ক্ষেত্রে বিপুল শূন্যপদ, রেলে নিয়োগ নেই, লোকো পাইলট, সেফটি, সিগনালিং-এ বিপুল পদ শূন্য ফলে দুর্ঘটনা বাড়ছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একজনকে তিনজনের কাজ করতে হচ্ছে। সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে একদল মেরুদণ্ড বিক্রি করেছেন, লুঠে মদত দিয়েছেন, আরেক দল মেরুদণ্ড সোজা করে লড়াই করেছেন। দেশ ও রাজ্য বাঁচানোর জন্য আজকের যে লড়াই চলছে তা কঠিন, কিন্তু কাটা বিছানো পথ অতিক্রম করেই লড়াইয়ের ময়দান থেকে জয় ছিনিয়ে আনতে হবে। মানুষকে সংঘবদ্ধ করে লুঠের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উদারীকরণের বিরুদ্ধে ভগৎ সিং বা ক্ষুদিরামের দেশ বাঁচানোর লড়াইটা আমরা করতে পারব।

কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন (AISGEF)-এর সহ সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন সারা ভারতবর্ষের শ্রমিক কর্মচারীরা আগামী ৩ নভেম্বর দিল্লীতে সমবেত হবেন। দাবিগুলি উত্থাপনের মূল কারণই হচ্ছে নয়া উদারনীতির আক্রমণ—তার বিরুদ্ধে লড়াই। আগামী দিনে আরও বৃহত্তর লড়াইতে যেতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতির নামে শুধুমাত্র সিলেবাসের পরিবর্তন নয়, নতুন নলেজ সিস্টেম চালু করা হচ্ছে। সমস্ত কিছুর পিছনেই রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করছে। দাবি আদায় তখনই সম্ভব হবে যদি নীতির পরিবর্তন ঘটানো যায়। তাই নীতির পরিবর্তন ঘটাতে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। মিছিল আমরা শখে করি না, হকের দাবিতে করি, আন্দোলন আমরা শখে করি না, হকের দাবি রক্ষার্থে করি। আগামী দিনে জেলায় জেলায় যৌথ কনভেনশন সংগঠিত করতে হবে।

রামলীলা ময়দান অভিমুখে মিছিল

দাবিগুলি যতক্ষণ না শ্রমিক কর্মচারীরা অর্জন করতে পারছেন, ততক্ষণ দেশজুড়ে ৭ দফা দাবিতে আন্দোলন চলবে। যৌথ আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে কোনও নতুন বিষয় নয়। আগামী দিনেও ঐক্যবদ্ধ যৌথ আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

যৌথ কনভেনশনে ৭ দফা দাবির সমর্থন ছাড়াও বক্তব্য রাখেন পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ রায়। যৌথ কনভেনশনের দাবি প্রস্তাব উপস্থিত সকলে সমর্থন করার পরবর্তীতে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়। □

দেবাশীষ রায়

কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় কক্ষের উদ্বোধন

উদ্বোধনের পরে নতুন কক্ষে নেতৃত্বরা

কলকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে দ্বিতলে পূর্বতন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভাঘরটি সংস্কার করে নবরূপে সজ্জিত করা হয়েছে। এই সভাকক্ষের নামকরণ রাজ্য সরকারী কর্মচারী তথা মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা প্রয়াত কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের নামে হয়েছে।

বিগত ১২ অক্টোবর '২৩ অফিস ছুটির পর নবরূপে সজ্জিত অজয় মুখোপাধ্যায় সভাকক্ষের উদ্বোধন করেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী। উদ্বোধনের পর অরবিন্দ সভাকক্ষে সমবেত কর্মচারীদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মূল বক্তা ছিলেন প্রবীর মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত অজয় মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র অমীক মুখোপাধ্যায়। □

হাজরা চলো

গত ৯ অক্টোবর ২০২৩, যৌথ মঞ্চের আহ্বানে বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবি সহ অন্যান্য দাবিতে কলকাতায় ধর্মতলা থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত একটি মহামিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল শেষে অন্যান্য নেতাদের সাথে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

আলোচনা সভা

বিগত ৬ অক্টোবর হাওড়া জেলার কর্মচারী ভবনে "সংগঠন, সংগ্রাম আন্দোলনে কয়েকটি বিশেষ প্রসঙ্গ" বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হল একটি আলোচনা সভা। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলার সভানেত্রী শেফালী নস্কর। সভায় উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলার ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক বিজন মান্না। সভায় প্রারম্ভিকভাবে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জেলার সম্পাদক সঞ্জয় দাস। সভার মূল আলোচক ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও মুখপত্র 'সংগ্রামী হাতিয়ার'-এর সহযোগী সম্পাদক সুমন কান্তি নাগ। তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সংগঠন কী ও কেন এবং সময়ের সাথে সাথে সংগঠনের বিবর্তনের ধারায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এগিয়ে চলার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতে অতিক্রম করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক প্রক্রিয়া গ্রহণের আহ্বান জানান। এই সভায় জেলার প্রায় ৫০ জন সদস্য-কর্মী-নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। □

সমিতি, জেলা, অঞ্চলের কর্মসূচী

স্মার্ট মিটার—বিক্ষোভ, জলপাইগুড়ি

সংগ্রামী হাতিয়ার পাঠক সভা, হাওড়া

নবীনবরণ, লবণহ্রদ অঞ্চল

কর্মীসভা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

স্বাধীনতা দিবসে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক কর্মসূচী

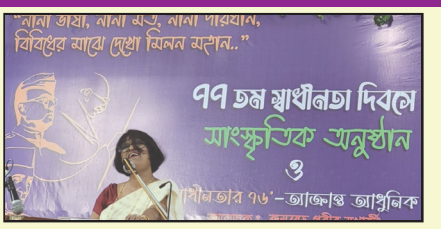

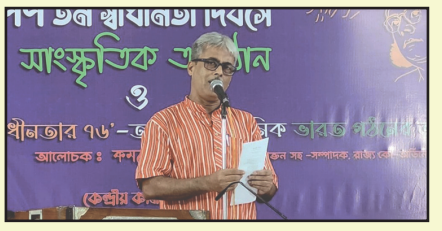

ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টস সমিতির আন্দোলন কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখছেন আইনজীবী সব্যসাচী চ্যাটার্জী

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।